ফরিদপুরের ইতিহাস।

(ভৌগোলিক তত্ত্ব ও প্রাচীন ইতিবৃত্ত)

১ম খণ্ড।

শ্রীআনন্দনাথ রায় প্রণীত।

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাবলীর অন্তর্গত নং ২৫।



কলিকাতা,

২১০।৫ কর্ণওয়ালিস্-ষ্ট্রীট্, নব্যভারত-প্রেসে,

শ্রীভূতনাথ পালিত দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কার্ত্তিক, ১৩১৬।

   মূল্য ৸/০ আনা।

কয়েকটি কথা।

অবস্থার পরিবর্ত্তনে, নানাবিধ দুর্ঘটনায় পতিত হইয়া, যথাসময়ে এই ইতিহাসখানা মুদ্রিত করিয়া উঠিতে পারি নাই। যে যে মহাত্মার পুস্তক হইতে এতৎসম্বন্ধে সাহায্য পাইয়াছি, তাঁহাদের নাম যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইয়াছে। পর্য্যটনদ্বারা বহু তথ্য সংগ্রহ করিতে ও প্রবাদমূলক কথা অবলম্বন করিতে ত্রুটি করি নাই। এজন্য পাথেয় খরচাদি যথেষ্ট লাগিয়াছে।

১৩০৭ সনে প্রথম "বারভুঞা" প্রবন্ধ নির্ম্মাল্য পত্রিকায় আরম্ভ করিয়া ১৩১৩ সন পর্য্যন্ত নব্যভারত পত্রিকায় লিপিবদ্ধ করি। ডাক্তার ওয়াইজ এসিয়াটীক জার্ণেলে প্রথম কেদার রায়, ফজলগাজী প্রভৃতি কয়েক জনের বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন। তদবলম্বনে শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয় অতি সামান্য বিষয় সংগ্রহ করিয়া উহা প্রবন্ধাকারে বাহির করেন। চাঁদ ও কেদার রায়ের রাজ্যের বিশেষ বিবরণ ও অমাত্যগণের নাম এবং মানসিংহ সহিত তাঁহার যে লিপি চলিয়াছিল, তিনি তাহা অবগত ছিলেন না। উহা আমার প্রবন্ধ বাহির হইবার পূর্ব্বে আর কেহই কখন উল্লেখ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। সুখের বিষয় এই যে, মৎসংগৃহীত ঐ সকল উপকরণ লইয়া বঙ্গবিক্রম ও কেদার রায় প্রভৃতি কয়েকখানা নাটক ও নভেল প্রণীত হওয়ায়, আমার পরিশ্রম সার্থক বিবেচিত হইয়াছে। মুকুন্দ রায়ের বিবরণ ওয়াইজ লিপিবদ্ধ করেন নাই, কাজেই সিংহ মহাশয়ও তাহাতে হস্তক্ষেপ করেন নাই। ১২৯৯ সনের ফাল্গুন মাসের ভারতীতে মুকুন্দরাম রায় নামে এক প্রবন্ধ বাহির হয় বটে, কিন্তু তাহাতে ইতিহাসের কোন কথাই ছিল না, কেবল তৎকালীন দেশের কথা মাত্র ছিল। মূল আকবর নামা হইতে অনুবাদ করিয়া এই প্রবন্ধটীর অবতারণা করিয়াছি। কেদার রায় ও মুকুন্দ রায় সম্বন্ধে সংক্ষেপ বিবরণ এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিলাম, বিস্তারিত বিবরণ "বারভুঞা" পুস্তকে প্রকাশিত হইতেছে।

অতি অল্প লোকেই সংগ্রাম সাহেব নাম পরিজ্ঞাত ছিলেন, তৎসম্বন্ধে কোন প্রবন্ধ এপর্য্যন্ত বাহির হয় নাই, পাঠকগণ উহার প্রতি মনঃসংযোগ করিলেই সমুদয় জানিতে পারিবেন।

গৌরদার প্রস্তর-লিপির ইতিহাস, ফরিদপুরের উকীল শ্রীযুক্ত মৌলবী

আবদুল রহমান সাহেব অনুগ্রহ করিয়া প্রদান করায় আমি তাঁহার নিকট চিরবাধিত আছি।

নানাকারণে অত্যল্প পৃষ্ঠা সম্বল লইয়া আমাকে সর্ব্ব সমক্ষে উপস্থিত হইতে হইল, এইটুকু যদি তাঁহাদের কোন অংশেও তৃপ্তিদায়ক হয়, তবে আমার পরিশ্রম সফল জ্ঞান করিব।

পুস্তকের সৌষ্ঠব সাধনার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে পারি নাই, ভাষার অঙ্গহানিও যথেষ্ট হইয়াছে, সহৃদয় পাঠক ও সমালোচকগণ ক্ষমা করিবেন।

যাঁহাদের নিকট কোন না কোনরূপ উপকার পাইয়াছি, তাঁহাদের নাম উল্লেখ করা কর্ত্তব্য, কিন্তু উহা সম্যকভাবে পারিয়া উঠিলাম না বলিয়া দুঃখিত রহিলাম। স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় দ্বারকানাথ সেন কবিরাজমহাশয়, ফরিদপুরের স্বনামধন্য শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ মজুমদার মহাশয়, কলিকাতা-বাসী সুবিখ্যাত জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু প্রফুল্লনাথ ঠাকুরমহোদয়, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস রায়, শ্রীযুক্ত রাজা সূর্য্যকুমার রায় ও ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট সুলেখক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র মোহন সিংহ মহাশয়গণের নাম উল্লেখযোগ্য, কারণ আমার অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়া তাঁহারা সাহায্য না করিলে আমি কখনই এই ইতিহাস লেখা ব্যাপারে লিপ্ত থাকিতে পারিতাম না।

নব্যভারত-সম্পাদক শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসন্ন রায়, সুলেখক শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু ও উকীল শ্রীযুক্ত বিনোদীলাল ঘোষ প্রভৃতি মহোদয়গণকে আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা কর্ত্তব্য।

অতঃপর আর দুই খণ্ডে এই গ্রন্থ পরিসমাপ্ত হইবে, ম্যাপ ও চিত্রাদি তাহাতে অধিকতররূপে সন্নিবেশিত থাকিবে। বর্ত্তমান সংখ্যা সহ অগ্রিম মূল্য ২৲ টাকা। অপর দুই খণ্ডে পৃষ্ঠাও অত্যধিক থাকিবে।

৩১ নং প্রসন্নকুমার ঠাকুরের ষ্ট্রীট, গ্রন্থকারের নিকট ও ২০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট মজুমদার লাইব্রেরীতে, ফরিদপুর পুস্তকালয় সমূহে, মাদারীপুরের উকীল শ্রীবিনোদিলাল ঘোষ মহাশয়ের ও জপসা, শ্রীজিতেন্দ্রনাথ রায় নিকট এই পুস্তক পাওয়া যাইবে। পোঃ উপাসী।

কয়েকখানা চিঠির অংশ।

মুর্শিদাবাদ-কাহিনী ও মুর্শিদাবাদের ইতিহাস লেখক সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত বাবু নিখিলনাথ রায় বি-এল মহাশয়ের চিঠী হইতে উদ্ধৃত।

"শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ রায় আমার সুপরিচিত, কেবল আমার বলিয়া নহে,

বাঙ্গালার সাহিত্য জগতে তিনি বিশেষরূপ প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছেন। ইহার "বারভূঞা" প্রভৃতি প্রবন্ধ স্বাধীন ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের ফলস্বরূপ বঙ্গ-সাহিত্যে প্রশংসা লাভ করিয়াছে।"

ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত বাবু যতীন্দ্রমোহন সিংহ বি-এ মহাশয়ের পত্র হইতে। বৈদ্যনাথ দেওঘর,১৪ই নভেম্বর,১৯০৪।

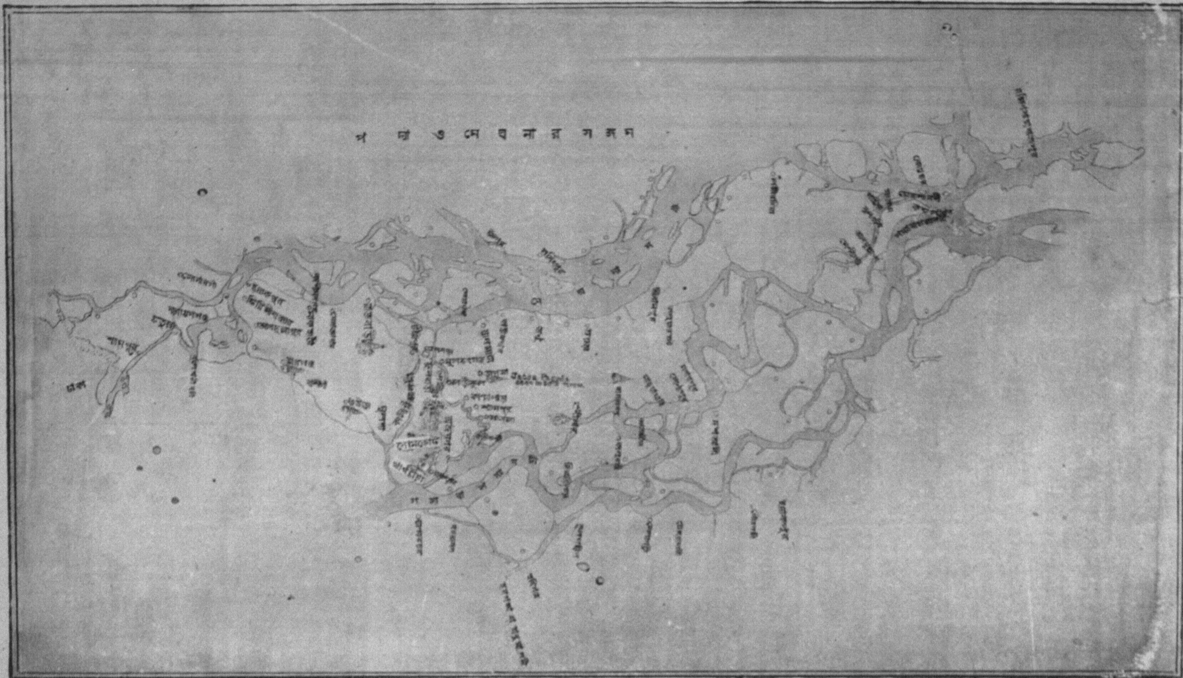
"আপনি সম্প্রতি ফরিদপুরের জেলার ইতিহাস লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, ইহা ফরিদপুরবাসী মাত্রেরই গৌরবের বিষয়। এই গুরুতর কার্য্যের ভার উপযুক্ত ব্যক্তির হস্তেই পড়িয়াছে, ইহা আমাদের বিশেষ আনন্দের বিষয়।"

"আমি আপনার ন্যায় প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিককে যে এ বিষয়ে কোন নূতন তথ্য দিতে পারিব, এরূপ দাবি রাখি না। বরং আপনার লিখিত সেই বার-ভূঞার কাহিনী হইতে আমি অনেক নূতন কথা শিখিয়াছি।"

"প্রফেসর শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম এ মহাশয়-লিখিত—

"সম্প্রতি আমাদের দেশে যে কয়েকজন ব্যক্তি বাঙ্গালার প্রচীন ইতিহাস উদ্ধারের চেষ্টায় আছেন, আনন্দ বাবু তন্মধ্যে অন্যতম। প্রাচীন কিংবদন্তী ও স্বদেশের প্রাচান কীর্ত্তির ভগ্নাবশেষ ও প্রাচীন গ্রন্থাদি অবলম্বনে এদেশের প্রাচীন ইতিহাসের কিয়দংশ এখনও রক্ষিত হইতে পারে। দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের এদিকে একবারে দৃষ্টি পর্য্যাপ্ত নাই। ইতিহাস উদ্ধারের ঐ উপায়গুলিও ক্রমে লুপ্ত হইতে চলিয়াছে. এখনও যাহা উদ্ধারের উপায় আছে, কিছু দিন পরে তাহাও আর থাকিবে না। আনন্দ বাবু যেরূপ আন্তরিকতা সহকারে এবিষয়ে আয়োজন করিতেছেন, তাহাতে সাধারণের উঁহার নিকট কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। আমি তাঁহাকে এজন্য অতিশয় শ্রদ্ধা করি। আনন্দ বাবু বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সম্মুখে কয়েকটি ঐতিহাসিক প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। ঐ প্রবন্ধগুলি পরিষৎ বিশেষ সমাদরের সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন ও সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকায় উহা যথাকালে বাহির হইয়াছে। লেখক যে পরিশ্রম ও অনুসন্ধান দ্বারা ঐতিহাসিক তথ্যের নির্ণয়ে প্রবৃত্ত আছেন,ঐ প্রবন্ধ হইতেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। সম্প্রতি আনন্দ বাবু বঙ্গের বিখ্যাত বারভূঞার ইতিহাস সঙ্কলনে প্রবৃত্ত আছেন ও অনেক কিংবদন্তীও বিবর সংগ্রহ করিয়াছেন। সংকলিত বিবরণ পুস্তকাকারে প্রকাশ করা উচিত। দেশের ধনী ও কৃতবিদ্য মহোদয়গণ লেখককে সাহায্য করিবেন। সাহিত্য পরিষদের অর্থ বল থাকিলে আমি পরিষদকে প্রচারের ভার লইতে অনুরোধ করিতাম।

প্রাচীন ম্যাপ



PUBLISHED ACCORDING TO ACT OF PARLIAMENT BY J. RENNELD, JULY 20th 1780

ফরিদপুরের ইতিহাস।

সীমা।

উত্তরে পদ্মা ও পাবনা জেলা, পশ্চিমে নদিয়া জেলার অন্তর্গত কুষ্টিয়া সবডিভিসন ও বাবাসীয়া, মধুমতী ও যশোহর জেলা, দক্ষিণে খুলনা ও বাখরগঞ্জ জেলা, নয়াভাঙ্গিনী নদী, পূর্ব্বে নোয়াখালী, ত্রিপুরা এবং ঢাকা জেলা; যথাক্রমে মেঘনা ও পদ্মা নদী দ্বারা বিভক্ত। ২৩—৫৪—৫৫ এবং ২২—৪৭—৫৩ উত্তরদ্রাঘিমার মধ্যে এবং ৮৯—২১—৫০ এবং ৯০—১৬ পূর্ব্ব দ্রাঘিমার মধ্যে অবস্থিত। ১৮৭১ সনের সার্ব্বে-জেনেরেলের পরিমাপে ইহার পরিমাণ ছিল ১৫২৪০৬ স্কোয়ার মাইল এবং লোক সংখ্যা ছিল ১৮৭২ খ্রীঃ সেনসেসে ১৫৩০২৮৮ জন। বর্ত্তমান সময়ে মাদারিপুর সবডিভিসন ইহার অন্তর্গত হওয়ায় পরিমাণ আরও বর্দ্ধিত হইয়াছে। অধুনা লোক সংখ্যা ১৯৩৭৬৪৬ এবং পরিমাণফল ২২৮১ স্কোয়ার মাইল। সদর ষ্টেশন ফরিদপুর পদ্মার পশ্চিম তীরে ঢাকা হইতে ৩৮ মাইল দূরবর্ত্তী। কলিকাতা হইতে ১৫০ মাইল ঈশান কোণে অবস্থিত।

ফরিদপুর প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত, ১ সদর, ২ মাদারীপুর, ৩য় গোয়ালন্দ। পরে বিস্তারিত ভাবে এই তিন বিভাগের বিবরণ উল্লেখ করা যাইবে।

নিম্নলিখিত পরগণাগুলি ও অন্যান্য কতকগুলি তালুকের সমষ্টি লইয়া এই জেলার সংস্থিত প্রধান পরগণা গুলির নাম, পরিমাণ ও সদর রাজস্ব উল্লেখ করা হইল।

১। বিক্রমপুর ২৩ স্কোয়ার মাইল, কর ৩ পাউণ্ড ১ ষ্টেট।

২। ফতেজঙ্গপুর ৩৫৯০ স্কোয়ার মাইল ১১০টী ষ্টেটের কর ৭৬৩ পাউণ্ড ২ সিলিং। *

---

* ১৮৭১ সাল পাউণ্ড ও সিলিং এর যে দর ছিল, তদনুসারে টাকার ও আনার হিসাব করিতে হইবে

৩। হবিবপুর ১৫.৯৯ স্কোয়ার মাইল ১ ষ্টেট কর ৮৭ পাউণ্ড।

৪। ইদিলপুর ২৪২.৭৯ স্কোয়ার মাইল ৫০২ ষ্টেট কর ৭৯৭৭ পাউণ্ড ১৮ সিলিং।

৫। ইদ্রাকপুর ২৪২.৭৯ স্কোয়ার মাইল ৬৩ ষ্টেট কর ৫৬৯ পাউণ্ড ১০ সিলিং।

৬। জালালপুর ৯.৩৪ স্কোয়ার মাইল কর ৮৫ পাউণ্ড ১ ষ্টেট।

৭। কাদিরাবাদ তপ্পা ৩.৩৮ স্কোয়ার মাইল কর ১৫৬ পাউণ্ড ২ ষ্টেট।

৮। কাশীমপুর সেলা পাট্টি ৬.১৭ স্কোয়ার মাইল ৯৯ ষ্টেট কর ৮১২ পাউণ্ড।

৯। কোটালীপাড়া ৮৫.৯২ স্কোয়ার মাইল ৫০২ ষ্টেট কর ২৩৪ পাউণ্ড ১৮ সিলিং।

১০। মাদারিপুর ১২.২৪ স্কোয়ার মাইল ৫ ষ্টেট কর ৮২ পাউণ্ড ১০ সিলিং।

১১। মুর্শিদ কোটাল জায়গীর .২১ স্কোয়ার মাইল ৪২ ষ্টেট কর ৮২ পাউণ্ড ৮ সিলিং।

১২। রামনগর ১১.৯৭. স্কোয়ার মাইল ১৮ ষ্টেট কর ৮৭ পাউণ্ড ১৬ সিলিং।

১৩। সফিপুর কালাতপ্পা ৩২০ স্কোয়ার মাইল ৮৬ ষ্টেট কর ১১৪ পাউণ্ড।

এই সকল পরগণার কোন কোন অংশ বাখরগঞ্জের কালেকটরীর তৈজিভুক্ত।

ফরিদপুরের খাস তৈজি।

১। অমরাপুর ০.৫ স্কোয়ার মাইল ১ ষ্টেট কর ৩ পাউণ্ড ২ সিলিং।

২। আমিরাবাদ ৬.৬২ স্কোয়ার মাইল ৫ ষ্টেট কর ২৬৬ পাউণ্ড ১০ সিলিং।

৩। আমীর নগর কিম্বা আমীরগড় ৩.৯৩ স্কোয়ার মাইল ১ ষ্টেট কর ১১৫ পাউণ্ড ১৪ সিলিং।

৪। বৈকুণ্ঠপুর ৬.৩১ স্কোয়ার মাইল ৯ ষ্টেট কর ২৪৬ পাউণ্ড ১৬ সিলিং।

৫। বাকীপুর ০.২১ স্কোয়ার মাইল ১ ষ্টেট কর ৯ পাউণ্ড ১৪ সিলিং।

৬। বাউলার ০.০৭ স্কোয়ার মাইল ১ ষ্টেট কর ৮ সিলিং।

৭। বন্দরখলা ০.৬৯ স্কোয়ার মাইল ২ ষ্টেট কর ১২৮ পাউণ্ড ১২ সিলিং।

৮। বেলগাছী ৩২.৬০ স্কোয়ার মাইল ২৮ ষ্টেট কর ৭৯৫ পাউণ্ড।

৯। বিনোদপুর তপ্পা এরিয়ার উল্লেখ নাই ১ ষ্টেট কর ৪ পাউণ্ড।

১০। বিরাহিমপুর ১৪.১৯ স্কোয়ার মাইল ২ ষ্টেট কর ২৭৭ পাউণ্ড ১২ সিলিং।

১১। বীবমোহন ৪৫ ৬৩ স্কোয়ার মাইল ৬০২ ষ্টেট কর ৯৫৫ পাউণ্ড ১৪ সিলিং।

১২। ধূলদী ৫৭ ৭৪ স্কোয়ার মাইল ৫৯ ষ্টেট কর ১০৪৪ পাউণ্ড ৪ সিলিং।

১৩। ফতেজঙ্গপুর এরিয়ার উল্লেখ নাই ১৯ ষ্টেট কর ১৫৮ পাউণ্ড ২ সিলিং। *

১৪। গঙ্গাপথ ০.০৫ স্কোয়ার মাইল ৬ ষ্টেট কর ২২৬ পাউণ্ড ১০ সিলিং।

১৫। হাকিমপুর ২১৯০ স্কোয়ার মাইল ৩২ ষ্টেট কর ২৪ পাউণ্ড ৪ সিলিং।

১৬। হাবেলী ৪.৪০ স্কোয়ার মাইল ১৩১ ষ্টেট কর ১১৮ পাউণ্ড ১৬ সিলিং।

১৭। জাহাঙ্গির নগর ০.১১ স্কোয়ার মাইল ২ ষ্টেট কর ৪ পাউণ্ড ২ সিলিং।

১৮। জালালপুর ১০৪.৭৭ স্কোয়ার মাইল ৬৮৭ ষ্টেট কর ১৩৪১ পাউণ্ড। †

১৯। কাসথা সাগর ০.৪৪ স্কোয়ার মাইল ৬৮৭ ষ্টেট কর ১৩৪১ পাউণ্ড।

২০। কাশীম নগর ৭.৫৩ স্কোয়ার মাইল ২২ ষ্টেট কর ২২২ পাউণ্ড ৮ সিলিং।

২১। কোষা ০.০১ স্কোয়ার মাইল ১ ষ্টেট কর ৮ সিলিং।

২২। মহিমসাহী ৯.১৬ স্কোয়ার মাইল ২৭ ষ্টেট কর ২১৭ পাউণ্ড ১০ সিলিং।

২৩। মহম্মদপুর ৪.৩৩ স্কোয়ার মাইল ১১৪ ষ্টেট কর ১৫৫ পাউণ্ড ১৪ সিলিং।

---

* পূর্ব্বে একবার উল্লেখ হইয়াছে।

† পূর্ব্বে একবার উল্লেখ করা হইয়াছে।

২৪। মুবারকপুর উজিলা .০৪ স্কোয়ার মাইল ১ ষ্টেট কর ৩ পাউণ্ড ১০ সিলিং।

২৫। মুকিমপুর ৭.৫৯ স্কোয়র মাইল ৮ ষ্টেট কর ৫৪ পাউণ্ড ৮ সিলিং।

২৬। নলদী ৬৫,১৮ স্কোয়ার মাইল ১০৪ ষ্টেট কর ৭৫ পাউণ্ড ২ সিলিং।

২৭। নসবীসাহী ৪.৪৫ স্কোয়ার মাইল ৯ ষ্টেট কর ৭৫৬ পাউণ্ড ২ সিলিং।

২৮। নসরৎসাহী .১৮ স্কোয়ার মাইল ২ ষ্টেট কর ৫ পাউণ্ড।

২৯। নরুল্লাপুর ২.০৯ স্কোয়ার মাইল ৬৯ পাউণ্ড ৪ সিলিং।

৩০। পাটপাসার ১.৯৭ স্কোয়ার মাইল ৪ ষ্টেট কর ৬৯ পাউণ্ড ৪ সিলিং।

৩১। পোকতানী ১ ষ্টেট কর ২০৫ পাউণ্ড ৮ সিলিং।

৩২। রাজনগর ১.২৭ স্কোয়ার মাইল ৫ ষ্টেট কর ১৫ পাউণ্ড ১৪ সিলিং।

৩৩। রোকনপুর ·৩৭ স্কোয়ার মাইল ৩৫ পাউণ্ড ১৪ সিলিং।

৩৪। রূপাপাত তরফ ২৯.৫ স্কোয়ার মাইল ১ ষ্টেট কর ১০০৩ পাউণ্ড সিংলিং।

৩৬। সাতৈর ১২৮৬১ স্কোয়ার মাইল ৮৬ ষ্টেট কর ৪৫৭৬ পাউণ্ড ৮ সিলিং।

৩৭। সাহপুর তপ্পা ৮৪৭০৪ স্কোয়ার মাইল ৪৯ ষ্টেট কর ৩৭৬৬ পাউণ্ড।

৩৮। সেরদিয়া ১০৮৫ স্কোয়ার মাইল ১৮ ষ্টেট কর ৫৩ পাউণ্ড।

৩৯। সিন্দুরিয়া ২·০৯ স্কোয়ার মাইল ৮ ষ্টেট কর ২৩ পাউণ্ড ৬ সিলিং।

৪০। সুলতানপুর খড়রিয়া ১০·০৭ স্কোয়ার মাইল ১৪ ষ্টেট কর ২১ াউণ্ড।

৪১। তেলিহাটী ১৬৫৬৪ স্কোয়ার মাইল ২৪ ষ্টেট কর ১৫৭০ পাউণ্ড সিলিং।

৪২। তেলেহাটী আমিরাবাদ ১১·১৫ স্কোয়ার মাইল ১৭ ষ্টেট কর ২১৩ াউণ্ড ১৮ সিলিং।

৪৩। তেলীহাটী মহব্বৎপুর ১১·১৬ স্কোয়ার মাইল ১৭ ষ্টেট কর ৪০৮ াউণ্ড ১০ সিলিং।

৪৪। কার্ত্তিকপুর, সেলিমপ্রতাপ, খুটনেকপুর, চাউলার, বেগী, ীপুর প্রভৃতি পরগণা আছে।

প্রধান চর।

১। উজানচর প্রায় ৯১৭৯ একর (২) চর টাঁপ্রাকান্দী ৫১২৭ একর (৩) চর নাজীরপুর ১১৭৩৫ একর (৪) চর ভদ্রাসন ৭৩৪০ একর (৫) চর জজিরা ষ্টেসন শিবচর ও পালং মধ্যে (৬) চর নৌকাডুবি ঐ ষ্টেসন মধ্যে (৭) চর কালকিনী আরিয়লখাঁ ও ফাইসাবতলা নদীর মধ্যে (৮) চর পঞ্চহাজারি ২৮২৬ একর (৯) চর খালপুরা ১৮৩৮ একর (১০) রাজার চর ১৮৫৮ একর (১১) চর দত্তপাড়া অরিয়ালখাঁ নদীতীরে (১২) চর ছোলাছির বন্দরখলা বরমগঞ্জের নিকট (১৩) চর জমালপুর আজাপুরের নিকট (১৪) লাউজানা আশাপুর মথুরাপুরের নিকট (১৫) চর মুকুন্দিয়া ১৬ তরফ বাইলাড় ১৭ বেটকা ১৮ তরফ কৃষ্ণনগর ১৯ মাধবদী ২০ পদ্মার মধ্যবর্ত্তী হাকিমপুর শ্যামনগর, কালীনগর ইত্যাদি।

(বিল)

১। ঢোলসমুদ্র ফরিদপুরের দক্ষিণ পূর্ব্বাংশে সংলগ্ন এক সময়ে ইহার আয়তন ৮ মাইল ছিল, পরে বর্ষার সময়ে প্রায় দুই মাইল জলপূর্ণ থাকিত। অধুনা গ্রীষ্মকালে প্রায় শুষ্ক হইয়া যায়।

২। বিলপাটীয়া বেলগাছীর নিকট বর্ষার সময়ে প্রায় ২ মাইল হইতে ৩ মাইল প্রশস্ত হইত।

৩। বিল হাতিমোহনা ২॥ মাইল দীর্ঘ ২ মাইল প্রশস্ত ছিল।

৪। রামকেলী সাতৈরের নিকট প্রায় ১৫ মাইল দীর্ঘ ৬ মাইল প্রশস্ত।

৫। নসীবসাহী বিল ১৬ মাইল দীর্ঘ ৬ মাইল প্রশস্ত; ইহা মুকসুদপুর থানা বিলমটর, চাঁদার বিল, বকসীর বিল পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

৬। কাজলার বিল।

৭। বাঘিয়া কোটালিপাড়ার উত্তর।

৮। রামশীলা দীঘি।

৯। বড়য়া।—এই সকল বিলের অধিকাংশ জমি উত্থিত হইয়াছে।

নদী।

এই জেলার সীমান্তে দুইটী বড় নদী বিদ্যমান; উহার একটী পদ্মা অপরটী মেঘনা।

পদ্মা জেলার উত্তর পূর্ব্বাংশে পাবনা ও ঢাকা হইতে জেলাকে বিভক্ত করিতেছে। ইহা প্রথমতঃ মুগিডাঙ্গার নিকট "ভেলবারিয়া" ফ্যাক্টরির উত্তর পশ্চিমাংশ স্পর্শ করিয়া গোয়ালন্দের নিকট যমুনা সহিত মিলিত হইয়াছে। সাধারণতঃ এই সংযোগ বাইশ-কোদালীয়া নামে পরিচিত। * বর্ষার সময়ে উহার জলস্রোত এত প্রবলভাবে দক্ষিণদিকে ধাবিত হয় যে, অতি বেগগামী আসামের ষ্টীমার পর্য্যন্ত উহা ভেদ করিয়া অগ্রসর হইতে পারে না। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের এক রিপোর্টে কালেক্টর সাহেব লিখিয়া যান্ যে, এই বৎসর ৬ খানা ফ্লাটসহ ষ্টীমার পদ্মা যমুনা সংযোগ ভেদ করিয়া উঠিতে না পারায়, কতক দিন গোয়ালনন্দ নঙ্গর করিয়া থাকিতে বাধ্য হয়। এই সময়ে গড়াই নদী দ্বারা পদ্মার গতি পরিবর্ত্তিত হইবার সম্ভাবনা হইয়া উঠে। কর্ণেল গেষ্টল কর্ত্তৃক পরিমাপে তৎ সময়ে গোয়ালনন্দের নিকট পদ্মার প্রশস্ততা গ্রীষ্ম সময়ে ১৬০০ গজ বলিয়া অবধারিত হয়।

পদ্মার একটী শাখার নাম আরিয়ল খঁা, ইহার উপরের দিকের নাম ছিল, ভুবনেশ্বর। ১৮০১ সালে ঠগি দমন জন্য আরিয়ল খঁা নামীয় এক জমাদার গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত হয়। ভুবনেশ্বর হইতে এক খাল খনন করাইয়া উহা প্রাচীন পদ্মার দক্ষিণাংশের সহিত সংযুক্ত করিয়া দেওয়ায়, উহাই কালক্রমে প্রবল রূপ পরিগ্রহ করিয়া প্রাচীন পদ্মা ও ভুবনেশ্বরের কতকাংশ গ্রাস করিয়া ফেলে ও সাধারণের নিকট আরিয়ল খঁা নামে পরিচিত হয়। এই নদী ফরিদপুর হইতে কতক মাইল দূরে চর মুকুন্দিয়া নামে দ্বীপ গঠিত করিয়া,

* একবার অতি বৃষ্টিতে মাঠে অত্যন্ত জল জমিয়া যায়, এমতাবস্থায় বপন কার্য্যের বিশেষ অসুবিধা নিবন্ধন ঐ জল নিঃসরণের জন্য এক পরিবারের বাইশটী লোক এক একখানা কোদালী লইয়া যমুনার ও পদ্মারদিগের উচ্চ ভূমিখণ্ড খনন করিয়া জল বাহির করিয়া দেয়। বর্ষার পূর্ণতা সহ যমুনার জলস্রোত ব্রহ্মপুত্রের দিকে মন্দগতিতে চলিয়া এই পয়ঃপ্রণালীর যোগে দ্রুত ভাবে পদ্মায় পতিত হইতে থাকে; ২।৩ বৎসরের মধ্যে এইরূপে যমুনাপদ্মার সংযোগে বহুগ্রাম প্রান্তর ভগ্ন হইয়া এই নূতন সংযুক্ত স্থান বর্ষার সময়ে দুরতিক্রমনীয় হইয়া দাঁড়ায়। বাইশকোদালে প্রথম উদ্ভব বলিয়া উহার নাম হয় "বাইশ কোদালিয়া"।

প্রথমতঃ দক্ষিণ পূর্ব্বদিক, পরে দক্ষিণদিকে প্রবাহিত হইয়া মাদারীপুরের নিম্ন দিয়া কালকিনী চরের পূর্ব্বাংশ দিয়া ফুল্‌তলা নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। বর্ষার সময়ে ইহার প্রশস্ততা ১৬০০ গজ হয়। নীলখীর খাল ইহার ২।৩ মাইল অতিক্রম করিয়া আরিয়ল খাঁ হইতে কুমার পর্য্যন্ত প্রবাহিত হইতেছে। গ্রীষ্ম সময়ে ২৫ গজ ও বর্ষার সময়ে ৫০ গজ প্রশস্ত হয়।

নয়াভাঙ্গনী কালীনগরের নিকট আরিয়ল খাঁ নদী হইতে বাহির হইয়া ইদিলপুর ও শ্রীরামপুর ভেদ করিয়া মেঘনার সহিত মিলিত হইয়াছে। উত্তর, দক্ষিণ, পশ্চিমে বক্রগতিতে দীর্ঘ প্রায় ২২ মাইল। গ্রীষ্ম কালে ৮০০ শত গজ এবং বর্ষাকালে ১২০০ শত গজ প্রশস্ত হয়।

ফাইসাতলাব দোন আরিয়ল খাঁ হইতে বাহির হইয়া পাঙ্গাসিয়া পর্য্যন্ত দীর্ঘে প্রায় ৪½ মাইল। গ্রীষ্ম সময়ে ৬০ ও বর্ষার সময়ে ৮০ গজ প্রশস্ত হয়।

পদ্মার যে অংশ বিক্রমপুর ভেদ করিয়া মেঘনার সহিত মিলিয়াছে, উহার নাম কীর্ত্তিনাশা, প্রকৃত প্রস্তাবে পদ্মার গতি বিক্রমপুরের পশ্চিমদিক পরিত্যাগ করিয়া মরাপদ্মা নামে এবং প্রবলাংশ যাহা ১০০ বৎসরের মধ্যে উদ্ভূত হইয়া প্রাচীন কালী গঙ্গা বিলুপ্ত করিয়াছে, উহা কীর্ত্তিনাশা নামে পরিচিত।

মিঃ রেনেলের কৃত ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দের মানচিত্রে কীর্ত্তিনাশার নাম উল্লেখ নাই। ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে মিঃ টেইলার, তদীয় টপগ্রাফী অব্‌ ঢাকা পুস্তকে কাথারিয়া বা কীর্ত্তিনাশা নদীর বিষয় উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, চাঁদ ও কেদার রায় এবং নওপাড়ার বৈদ্য চৌধুরীদের কীর্ত্তি ভগ্ন করায় উহার নাম হয় কীর্ত্তিনাশা। প্রথম রথখলা পরে ব্রহ্মবধিয়া পরে কাথারিয়া সর্ব্বশেষে কীর্ত্তিনাশা নামে পরিচিত হয়। এই নদী বিক্রমপুরের বহু কীর্ত্তি উদরস্থাৎ করিয়াছে, তন্মধ্যে রাজনগর, জপসা ও কালীপাড়ার নাম উল্লেখযোগ্য। এই নদী দ্বারা বিক্রমপুর দ্বি ভাগে বিভক্ত হইয়া উত্তর ভাগ ঢাকা জেলায় এবং দক্ষিণ ভাগ ফরিদপুরের জেলার অন্তর্গত হইয়াছে। বর্ষার সময়ে উহার বেগ বড়ই প্রবলরূপ ধারণ করে এবং ভগ্নস্থানের গর্জ্জন বহুদূর পর্য্যন্ত প্রতিধ্বনিত হয়। পরিসর উত্তর দক্ষিণ পারের মধ্যে চারি হাজার গজ হইবে, কিন্তু বহু চড় থাকায় ততটা অনুমান হয় না। বর্ষার সময়ের গভীরতা স্থান বিশেষে ৫০।৬০ গজ পর্য্যন্ত হইয়া থাকে।

চন্দনা নদী ফরিদপুরের পশ্চিম সীমান্তে, মুগীডাঙ্গা গ্রামের নিকট জেলার একেবারে উত্তর পূর্ব্বাংশে গঙ্গা বা পদ্মা হইতে শাখারূপে বহির্গত হইয়াছে।

তৎপর ইহা বক্র গতি হইয়া পশ্চিম সীমা দিয়া কিন্তু সাধারণত পূর্ব্ব হইতে দক্ষিণ দিক দিয়া প্রবাহিত হইয়া, সৌদপুর বন্দরের নিকট মসলন্দপুরস্থ গড়াইতে পতিত হইয়াছে। ইহার গ্রীষ্মের সময় ৫০ গজ প্রশস্ত এবং বর্ষার সময় ৮০ গজ হইয়া থাকে। বৎসরের মধ্যে মাত্র ৫ মাস এই নদী দিয়া গমনাগমন করা যায়। নদিটী ক্রমেই ভরিয়া আসিতেছে। গ্রীষ্মের সময় ইহার গতির অনেকাংশ প্রায় শুষ্ক হইয়া যায়। চন্দনা এবং গড়াই একত্র সংযুক্ত হইয়া মধুমতী নামে ফরিদপুরের পশ্চিম সীমা দিয়া সমুদ্রাভিমুখে দক্ষিণ দিয়া প্রবাহিত হয়।

মধুমতী বড় নদী মাঝারি নৌকা দ্বারা পার হওয়া যায়। গ্রীষ্মের সময় ইহার প্রশস্ত ১৫০ গজ ও বর্ষার সময় ২০০ গজ হইয়া থাকে। মধুমতী এবং গড়াই নদী দিয়া ভারতবর্ষের সর্ব্বাংশে ব্যবসায় বাণিজ্য চলিতেছে। বৎসরের প্রত্যেক সময় বড় বড় নৌকা যাতায়াত করিতে দেখা যায়। সুন্দরবনের প্রবেশের ইহা একটী পথ ইহার পার দিয়া গুণ টানিয়া যাইতে বিশেষ সুবিধা। মধুমতীর একটী শাখা বারাশিয়া নদী গোয়ালবাড়ী নিকট মধুমতী হইতে বাহির হইয়া দক্ষিণাভিমুখে প্রায় ২০ মাইল প্রবাহিত হইয়া জেলার ভাটিয়াপাড়া গ্রামের নিকট মধুমতীর সহিত পুনরায় মিলিয়াছে। এই নদীতে বড় বড় নৌকা যোগে সমুদয় বৎসর পার হওয়া যায়। মধুমতীর উপশাখার নাম বানকাণা, কেহ কেহ নবগঙ্গা কহিয়া থাকে, কিন্তু এই সকল নদী যশোহর জেলা দিয়া প্রবাহিত, ফরিদপুরের মধ্যে নহে।

কুমার নদী। সিবিল ষ্টেশন হইতে বত্রিশ মাইল দূরে অবস্থিত কানাইপুর গ্রামের নিকট চন্দনা নদী হইতে কুমারনদী শাখারূপে বহির্গত হইয়াছে। পরে বক্রগতিতে বহির্গত হইয়া সাধারণতঃ উত্তর পশ্চিম হইতে দক্ষিণ পূর্ব্ব দিক দিয়া প্রবাহিত হওয়ার পর মাদারিপুরের নিকট ফরিদপুর পরিত্যাগ করিয়া বাখরগঞ্জের অন্তর্ভুক্ত হয়। বর্ষার সময় বাণিজ্য নৌকা দ্বারা ইহার উৎপত্তি স্থান হইতে কানাইপুর পর্য্যন্ত যাতায়াত করা যায়। তৎপর সমস্ত বৎসর পর্য্যন্ত মাদারিপুর পর্য্যন্ত যাওয়া যায়। দেশের আরো বৃদ্ধি জন্য কুমার নদীর দুইটী শাখা ব্যবহার করা যায়।

প্রধান শাখা শীতললক্ষা, তালমা পুলিশ ষ্টেশন হইতে আরম্ভ করিয়া তাজার নিকট কুমারের সহিত মিলিত হইয়াছে। বর্ষার সময় এই নদীতে নৌকা যোগে যাতায়াত করা যায়, কিন্তু গ্রীষ্মের সময় নয়। তালমা

ও আড়িয়া গয়েসপুর ভরিয়া যাওয়ায় গমনাগমন করা যায় না, যে সমস্ত স্থান ভরে নাই, তাহাতে গভীর জল থাকে। এই নদীতে সকল বৎসর গমনাগমন করা যাইতে পারে, যদি ইহার ঐ সমস্ত অংশ খনন করা হয়, তাহা হইলে ভাঙ্গা পর্য্যন্ত নৌকাযোগে যাতায়াত করা যায়। ভাঙ্গা এবং তালমার মধ্যে নৌকার সুবিধা হইলে বাণিজ্য বিস্তার ঘটিত পারে। কারণ তালমা হইতে ফরিদপুর পর্য্যন্ত রাস্তার বন্দোবস্ত আছে।

২য় শাখা বালুগাঁর নিকট চরটুকু, উপরে কুমার ছাড়িয়া জেলার দক্ষিণ অংশে বিলের মধ্যদিয়া প্রবাহিত হইয়া সর্ব্ব শেষে মধুমতীর সহিত মিলিত হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত নদীর মত এই নদীও স্থানে স্থানে খনন করা আবশ্যক। যদি এইরূপে নৌকাযোগে যাতায়তের সুবিধা হয়, তবে ফরিদপুর ও গোপালগঞ্জের মধ্যে বাণিজ্যের সুবিধা হইতে পারে। কুমার দুই শত গজ পর্য্যন্ত প্রশস্ত।

খাল।

কাওনীয়া রত্নদিয়া, মাতলাখালী, এই সকল খাল নসীপসাহী ও মহিম সাহীর মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া কুমার ও হাজীখালীর সহিত মিলিয়াছে। এতদ্ভিন্ন মাদারীপুরের, ধোপাডাঙ্গার, নওপাড়ার গোয়ালমারীর, গোয়ালার, পিঞ্জিরির, ফতেপুরের, গোয়াখালীর, ঘাগরের, বিনোদপুর বা চিকন্দীর, রাজগঞ্জ বা পালঙ্গের, ঘড়িশারের খাল ও বিল-রুট প্রশস্ত।

পথ।

প্রাচীন রাস্তা সম্বন্ধে রেনেলের মানচিত্রে দেখা যায়, ফরিদপুর হইতে এক প্রশস্ত পথ বরাবর উত্তরাভিমুখ হইয়া পাঠপাসার হাজীগঞ্জ অতিক্রম করতঃ বরাবর পূর্ব্বাভিমুখ হইয়া পদ্মার অপর তীরস্থ নবাবগঞ্জ হইয়া ঢাকা পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। অপর পথটী হাবাসপুর হইতে আরম্ভ হইয়া গোয়াল খাঁ, কুমারখালী, কুষ্টিয়া হইয়া এক শাখা জলঙ্গী নদীর তীরবর্ত্তী জয়রামপুর পর্য্যন্ত, অপর শাখা পদ্মার তীরস্থ সারদা পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে।

মূলফৎগঞ্জ হইতে অপর রাস্তা আরম্ভ হইয়া জপসা, নরিকুল হইয়া রাজ-

নগর পর্য্যন্ত, তথা হইতে কালীগঙ্গা অতিক্রম করিয়া উত্তরাভিমুখে ধানকুনীয়া, রাজাবাড়ী, সেরাজদী হইয়া ঢাকার দিকে চলিয়া গিয়াছে। রেনেলের ম্যাপে এই দুই রাস্তার চিত্রই দৃষ্ট হয়।

অপর আর একটী রাস্তার নাম "কাচকিগুড়ার দরজা" এটি ইদিলপুরের প্রান্তবর্ত্তী দেওভোগ হইতে আরম্ভ হইয়া মূলফৎগঞ্জের রাস্তা সহ মিলিয়াছিল। নানাবক্র গতিতে উহা বিক্রমপুরের মধ্য দিয়া ধলেশ্বরী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

নূতনরথ্যার মধ্যে ইষ্টারণ বেঙ্গল ষ্টেট রেলওয়ের লৌহবর্ত্ম গোয়ালন্দ হইতে কলিকাতা পর্য্যন্ত বিস্তৃত কিন্তু পদব্রজে গমনাগমনের সুবিধা নাই। অপর রাস্তা গোয়ালন্দ হইতে ফরিদপুর, ফরিদপুর হইতে তালমা। এতদ্ভিন্ন ফরিদপুর হইতে অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাস্তা ও পালং হইতে নগর ফতেজঙ্গপুরের রাস্তা ও মাদারীপুর হইতে বরিশালের অন্তর্গত গৌরনদীর এলাকার নিকটবর্ত্তী রাস্তা ও অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাস্তা দৃষ্ট হয়। নড়িয়া ও লোনসিংহের পথ অল্পদূর মাত্র বিস্তৃত। মোটের উপর পথকরের টাকা দ্বারা উচিতমত রাস্তা, খাল না হওয়ায় দেশীয় লোকের ক্লেশ মোচন হইতেছে না। বাদসাহীগবর্ণমেণ্টেরও হিন্দু রাজাদের সময়ে এদেশে রাস্তার বন্দোবস্ত বরং ভাল ছিল।

পশু, পক্ষী ও মৎস্য ইত্যাদি।

বাঙ্গালার বিভিন্ন স্থানের ন্যায় হিংস্র ও গ্রাম্য পশু, পক্ষী, সরিসৃপ, মৎস্য ইত্যাদি এই স্থানেও দৃষ্ট হয়। নদীতে কুম্ভীর ও শুশু এবং স্থলে ব্যাঘ্র, শূকর, বানর তত প্রচুর দেখা যায় না।

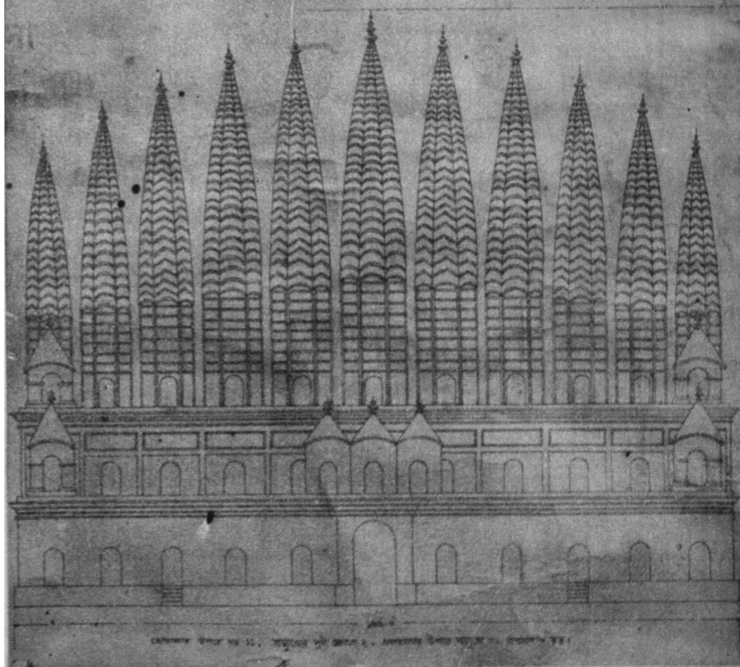
১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে রেনেলের মানচিত্রে যে যে প্রাচীন মন্দিরাদির পরিচয় আছে, এস্থলে তাহা উল্লেখ করা হইল।

১। খাগটীয়া একটী মঠের চিত্র।

২। রাজনগর দুইটী মঠের ও একটি জলাশয়ের চিত্র। সম্ভবতঃ সত্তর-রত্ন ও একুশরত্ন এবং রাজসাগরের চিত্র দেখান হইয়াছে।

৩। জপসা একটী মঠের চিত্র, কেবলমাত্র এই মঠের পার্শ্বে লেখা রহিয়াছে * এইমন্দির পদ্মা ও মেঘনা হইতে দেখা যায়। যাবতীয় মন্দির মধ্যে এইটী উচ্চঃছিল,অনুমান হয়।

*Japasa the pagoda seen in both rivers."



রাজনগরের একুশরত্ন।

৪। বেলাসার একটী মঠ (ইদিলপুরের দিকে)

৫। বাদরাসন একটী মঠ (ঐ)

৬। টেঙ্গারামারীর নিকটবর্ত্তী মসজীদ।

দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে,এক সময়ে যেটুকু রেনেলের ম্যাপ্ হইতে প্রয়োজন বোধে লিখিয়া রাখিয়াছিলাম,তাহাই এস্থানে উল্লেখ করা হইল, ফরিদপুরের অন্তর্গত অপর স্থানে যে দুই চারিটী প্রাচীন কীর্ত্তি ছিল, তাহা আর উহা হইতে লিখিয়া রাখা হয় নাই। রেনেলের সময়ে দক্ষিণবিক্রমপুর মধ্যে, সোমকোট, গোবিন্দমঙ্গল প্রভৃতি প্রসিদ্ধ গ্রামের অস্তিত্ব থাকা অবগত হওয়া যায়, কিন্তু কোন মন্দিরয়ের চিহ্ন দেখা যায় না। ঢোলসমুদ্র নামে একটি জলাশয়ের চিত্র দেখা যায়, যাহা রাজসাগর অপেক্ষাও বড় ছিল। উহা ফুলবাড়ীয়া গ্রামের নিকটবর্ত্তী বিধায়, চাঁদ ও কেদার রায়ের কীর্ত্তি বলিয়াই অনুমিত হয়। উল্লিখিত কীর্ত্তিগুলি এক্ষণে নদী কর্ত্তৃক বিলুপ্ত হইয়াছে।

জাতি ও ধর্ম্ম।

এই জেলা হিন্দু, ব্রাহ্ম, মুসলমান, খ্রীষ্টিয়ান, এই চারি জাতির বাসস্থান। হিন্দুর সংখ্যা ৭৩৩৫৫৫। তন্মধ্যে পুরুষ ৩৬০০১২; স্ত্রী ৩৭৩৫৪৩। ব্রাহ্ম মোট ৮৩; তন্মধ্যে পুরুষ ৪০ ও স্ত্রী ৪৩। জৈন পুরুষ ৫ জন মাত্র। বৌদ্ধ ১০ জন মাত্র। মুসলমান মোট সংখ্যা ১১৯৯৩৫১ জন, তন্মধ্যে পুরুষ ৬০৭৬৮৮ ও স্ত্রী ৫৯১৬৬৩। খ্রীষ্টান ৩৬৫৭জন। হিন্দু-শ্রেণী নানা ভাগে বিভক্ত— ফরিদপুর জেলায় ঠাকুর উপাধি ব্রাহ্মণও বাস করিতেছেন। ১৮৫৭ সনে প্রথমতঃ এই স্থানে ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত হয়। হিন্দুদের নানারূপ দেবদেবী বিভিন্ন স্থানে সংস্থাপিত আছেন। এতদ্ভিন্ন বহু বৃক্ষ দেবাধিষ্ঠান বলিয়া পূজিত হয়। মুসলমান-সম্প্রদায় মধ্যে ফরাজি বলিয়া এক সম্প্রদায় নূতন গঠিত হইয়াছে,স্থানান্তরে তাহাদের বৃত্তান্ত বিবৃত হইবে। অধিকাংশ নিম্নশ্রেণী হিন্দু বিশেষ নমঃশূদ্র-সম্প্রদায় হইতেই দেশীয় খ্রীষ্টানদলের উৎপত্তি। হিন্দুসমাজে নিতান্ত হেয়ভাবে আছে বলিয়া তাহারা স্বীয় পদমর্য্যাদা বৃদ্ধির জন্য এইরূপ জাত্যন্তর পরিগ্রহ করিয়াছে। ব্রাহ্ম হিন্দুর এক বিশেষ উন্নত শাখা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কালে উভয় আবার এক হইয়া যাইবে।

এই জেলায় হিন্দুদের মধ্যে নিম্নলিখিত শ্রেণী বিভাগ দৃষ্ট হয়।

১। ব্রাহ্মণ
২। ক্ষত্রিয়
৩। বৈদ্য।
৪। কায়স্থ।
৫। ছত্রী।
৬। গন্ধ বণিক।
৭। কামার।
৮। কুমার।
৯। আগরওয়ালা।
১০। আগুরি।
১১। তাম্বুলী।
১২। সদগোপ।
১৩। শূদ্র।
১৪। কুরমী।
১৫। তিলি।
১৬। মালী।
১৭। কাঁসারি।
১৮। শাখারী।
১৯। নাপীত।
২০। বৈষ্ণব।
২১। বারুই।
২২। কৈবর্ত্ত।
২৩। গাররী।
২৪। মদক।
২৫। গোপ বা গয়লা।
২৬। সুবর্ণ বণিক।
২৭। সেকরা
২৮। সূত্রধর।
২৯। সাহা।
৩০। পাইটাটী।
৩১। কলু;
৩২। তাঁতি।
৩৩। জুগী।
৩৪। চুনারী।
৩৫। পাইটাল।
৩৬। জেলে।
৩৭। কাড়াল।
৩৮। কারণী।
৩৯। মাল।
৪০। মাঝী।
৪১। পোদ।
৪২। চাঁয়র।
৪৩। পুবর।
৪৪। বাইয়তী।
৪৫। বেহারা।
৪৬। ধানুক।
৪৭। বাগদী।
৪৮। পাটনী।
৪৯। কোয়রী।
৫০। চাষা।
৫১। ধোপা।
৫২। কাচুয়ী।

৫৩। নমঃশূদ্র।
৫৪। কাপালী।
৫৫। বাউতী।
৫৬। কাহার।
৫৭। মুচি।
৫৮। পালী।
৫৯। বিন্দ।
৬০। চেল।
৬১। ডোম।
৬২। দোসাদ।
৬৩। কারাঙ্গী
৬৪। রাজবংশী।
৬৫। মাল।
৬৬। মালো।
৬৭। হাড়ী।
৬৮। কাওলি।
৬৯। ভূঁইমালী।
৭০। মিহাটার।
৭১। বুনা।
৭২। নর বা নট্ট।

জাগ্রত দেবতা ও ধর্ম্মশালা।

নলীয়ার হরি, মুকডোবার বাসুদেব, তালমার অন্তর্গত ছুলারডাঙ্গার কুশলনাথ শিবনাথ একটি বৃক্ষ; বেলগাছি ষ্টেশনের অন্তর্গত সাওতাপুরের বৃক্ষপুষ্করিণীসমন্বিত শিব (রাজ রাজেশ্বর) মাদারীপুরের বলরাম, রাজনগর(অধুনা পালঙ্গের) বাজা লক্ষ্মীনারায়ণ,জপসা (অধুনা নগরের) অভয়া, ধামুকার শ্যামা ও খান্দারপারের কালী বুড়োঠাকুর শিব, খাগরের (হিরণ ও পশ্চিমপাড়ার) শিব জাগ্রত বলিয়া প্রসিদ্ধ। এতদভিন্ন সর্ব্বাপেক্ষা জাগ্রত ও পিঠস্থান তুল্য মাঐসারের দিগম্বরীতলা অর্থাৎ অশ্বত্থ তল। স্থানান্তরে ইহার বিবরণ বিবৃত হইবে। জপসার প্রস্তর-নির্ম্মিত শিব সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও সুদর্শনীয় দেব প্রতিমূর্ত্তি। এতদ্ভিন্ন বেলগাছি ষ্টেশনের নিকট হারোয়া গ্রামের মদনমোহনের মন্দির। বেলগাছীয়া পরগণা পূর্ব্বে নাটোর রাজ ষ্টেটের অন্তর্গত ছিল। ইহা হইতে কেহ কেহ অনুমান করেন, উক্ত মন্দির এবং বিগ্রহ নাটোর রাজবংশেরই একটী কীর্ত্তি। এই মন্দিরাধিষ্ঠিত "মদনমোহন" অতি সুন্দর দ্বিভুজ মূর্ত্তি, প্রস্তর-নির্ম্মিত ১॥ হাত উচ্চ। মন্দিরের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ প্রচুর দেবোত্তর ভূমি প্রদত্ত হইয়াছে।

বেলগাছিতে প্রতিষ্ঠিত চৈতন্য দেবের মন্দির অতি প্রাচীন। কেহ কেহ বলেন, ইহা শ্রীচৈতন্য দেবের সমসাময়িক। মহাপ্রভুর মূর্ত্তি নিম্বকাষ্ঠের নির্ম্মিত। মন্দিরের গায়ে নানাবিধ প্রতিমূর্ত্তি খোদিত আছে।

পাংশা ষ্টেশনের অধীন মাদাপুর গ্রাম অতি প্রাচীন; এই গ্রামে দুইটী বট বৃক্ষের নীচে লোকেরা বহুকাল যাবৎ পূজা দিয়া আসিতেছে; বৃক্ষের তলদেশে একটি ইষ্টক-নির্ম্মিত ক্ষুদ্র মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়।

পাংশা মাধবপুরে সাজি নামে একদরবেশ ফকিরের কবর আছে। এখানে বহু কাল যাবৎ হিন্দু ও মুসলমানগণ সিন্নি দিয়া থাকে।

যে ত্রিনাথের মেলা পূর্ব্ব বঙ্গের প্রায় সমুদয় স্থানে ব্যাপ্ত হইয়াছে, উহার প্রথম ফরিদপুরের অন্তর্গত পালঙ্গ ষ্টেশনের অধীন নবীপুর গ্রামে উদ্ভব হয়। অধুনা এই স্থান কীর্ত্তিনাশার গর্ত্তস্থ হইয়াছে।

সাতৈর, খাবাসপুর, কার্ত্তিকপুরে,প্রাচীন মুকসুদপুরের অন্তর্গত দিগনগরে প্রায় ২৫০ বৎসর পূর্ব্বে দেওয়ান সাহাওয়াজ দ্বারা নির্ম্মিত এবং শাতরাইলে ও গেরদায় প্রাচীন মসজিদ আছে। এতদ্ভিন্ন মাদারীপুর ও ফরিদপুর প্রভৃতি স্থানে দুইটী নূতন মসজিদ নির্ম্মিত হইয়াছে।

ফরিদপুর নগরীতে ব্রাহ্মদের একটী মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে।

ফরিদপুর, কোটালীপাড়া ও গোপালগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে খ্রীষ্টিয়ানদের ধর্ম্মালোচনার ঘর নির্ম্মিত আছে।

বাণিজ্য, কৃষি, ও শিল্প।

ভাঙ্গা কুমারনদীতটে, চাউল, ধান্য, লবণ, খেসারী,সরিসার বাণিজ্যস্থান। ঘরষগঞ্জ আরিয়লখাঁ তীরে, গোপালগঞ্জ মধুমতী তীরে,চাউল, পাট, লবণ, ঘৃত, মাদুর; বোয়ালমারী ও সৈদপুর বারাসীয়াতীরে,দেশীতামাক, কাপড়, তুলা, লৌহ ও পিত্তল, কাঁসার জিনিষ; মধুখালী চন্দনাতীরে তামাক, লবণ; কামারখালী চন্দনাতীরে, চাউল, সরিসা, খেসারী; জামালপুর চন্দনাতীরে,তামাক; সেলিমাপুর, ধুলটী, আমবাড়ীয়া, পাঁচরিয়া; কানাইপুর প্রভৃতি অঞ্চলে বহু পরিমাণে বাণিজ্য দ্রব্য ক্রয়বিক্রয় হয়। ফরিদপুর গুড়ের ও দেশী কাপড়ের জন্ত; পাংশা ও বেলগাছী দেশী কাপড়, গামছা, ছিট প্রভৃতির জন্ত প্রসিদ্ধ। গোয়ালন্দ পূর্ব্ববঙ্গের বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থান, নানা স্থান হইতেই ষ্টীমার ও নৌকাযোগে নানাবিধ জিনিস এখানে উপস্থিত হইয়া বহুদূরদূরান্তরে প্রেরিত হইয়া থাকে।

মাদারীপুর, কুমারতীরে, পাট গুড়, তৈল প্রচুর প্রাপ্ত হওয়া যায়। বিশেষ এই স্থানে এবং আঙ্গারিয়া, টেকেরহাট, পালং ও মহুরা প্রভৃতি স্থানে

বিস্তর পাটের আমদানী হইয়া কলিকাতায় প্রেরিত হয়। আঙ্গারিয়ার, টেকেরহাটে ও বুড়ীর হাটে ইক্ষুগুড় প্রচুর বিক্রয় হয়, পালঙ্গে পিতলকাঁসার বাসনের বিস্তর কারবার। এতদ্ভিন্ন, গোয়ালা, ফতেপুর, কাঁসিয়াতলা, মুকন্দপুর খাজুরতলা, জলিরহাট, গাবতলী, খান্দারপাড়, শ্রীপুর, টেকেরহাট, বাতেবাইল, ভেড়ারহাট, বাতাডাঙ্গা গোবিন্দপুর, জয়নগর, টেঙ্গরাখোলা, ফতেপুর, ব্রাহ্মণদি, আমডউয়া, তাড়াইল, চাঁদেরহাট, বাউসখালী, দামোদরদি, আল্‌গি, কাশীয়ানী, উজানী, পুরাপাড়া, কৃষ্ণাইদিয়া, রূপাপাত, ফুলবাড়িয়া, আমগাঁ, বাইটকামারি মহারাজপুর, নগরকান্দা, ফলসী, তালমা, কবিরাজপুর, মহেন্দ্রদি, কালামৃধা, কুলপদী, হবিগঞ্জ, রাজোব, ভাটীয়াপাড়া, পুকুরিয়া, পোড়াদহ, ভাইলবাজার, টেকেরহাট, আঙ্গারিয়া (রাজগঞ্জ) মনোহররায়ের বাজার, চিকন্দী, মামুদপুর, গঙ্গানগর, কোঁয়পুর, নৈরা, মুলফৎগঞ্জ, ঘড়িসার, কার্ত্তিকপুর, সেনেরহাট (বোকাইনগর) কাঞ্চনপাড়া, ডামড্ডা, বিঝারী, কালুরগাঁ, গোঁসাইরহাট, হাটরিয়া, টেঙ্গরা, ভেদেরগঞ্জ, ঘাগর, বালীয়াকান্দী, রাজবাড়ী, বাণীবহ, বহরমপুর, দক্ষিণবাড়ী, গইয়াতলা, পারকলা, বালিয়াভাঙ্গা, বড়ডুমুরিয়া ও সুয়াগ্রাম প্রভৃতি স্থানে হাট ও বাজার আছে। মসুরা বা ভোজখরের বন্দর ক্রমে বিশেষ উন্নতিলাভ করিতেছে। এতদ্ভিন্ন চৈত্র সংক্রান্তি ও বৈশাখ মাসের প্রথম দিবস নানাস্থানে ১ দিবস ব্যাপী মেলা বা গলৈয়া বসিয়া থাকে। বৃহৎ মেলা যে সকল স্থানে হয়, তাহা পরে উল্লেখ করা যাইবে।

পালং ষ্টেসনের অন্তর্গত নিম্ন শ্রেণীর কায়স্থ পরিচিত শূদ্রগণ, কাঁসারীদের এবং কুম্ভকারগণের হাঁড়ি পাতিলের পাইকারী দ্বারা বিশেষ অবস্থার উন্নতি করিয়াছে। উহারা মাল বোঝাই করিয়া বাখরগঞ্জ, ত্রিপুরা, নোয়াখালী, ময়মনসিংহ জেলার নানা স্থানে উপস্থিত হইয়া পিত্তল ও কাঁসার জিনিস বিক্রয় করিয়া থাকে এবং হাঁড়ি, পাতিলের বিনিময়ে ধান্ত গ্রহণ করিয়া থাকে। ইহারা স্বহস্তে দাঁড় ও লগি ধরিয়া এবং মাথায় বোঝা লইয়া যেরূপ অধ্যবসায় সহকারে কারবার চালাইয়া থাকে, তাহা বাস্তবিকই আশ্চর্য্যের বিষয়। এই সকল পাইকারগণ মধ্যে আজকাল অনেকে বিশ ত্রিশ সহস্র টাকা সঞ্চয় করিয়াছে। এদিকে কাঁসারী ও কুম্ভকারগণও বিস্তর অর্থলাভ করিয়া কেহ কেহ লক্ষপতি পর্য্যন্ত হইয়াছে। এই শূদ্র-সম্প্রদায়ের দৃষ্টান্তে অধুনা প্রায় সকল নিম্নশ্রেণীর হিন্দুই এই ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছে, বহু মুসলমান

হাঁড়িপাতিলের ব্যবসায় ধরিয়া তদবিনিময়ে ধান্য সংগ্রহ করিতেছে। এই শূদ্রজাতির বহু লোক পাঁঠা ক্রয় বিক্রয় ও মৎস্যের ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া অর্থশালী হইয়া, উৎকৃষ্ট কায়স্থদের সহিত আদান প্রদান করিতে পর্য্যন্ত সমর্থ হইয়াছে। বাস্তবিক "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী" এই কথার সার্থকতা কতকটা ইহারা যথার্থরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছে।

তিলি ও সাহাগণ এ জেলার প্রধান ব্যবসায়ী ও ধনী, তাঁহাদের তেজারতি বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত; ব্যবসায়ে অর্থশালী হইয়া অনেকেই লক্ষপতি হইয়াছেন, তন্মধ্যে কেহ কেহ রায় বাহাদুর উপাধি পর্য্যন্ত লাভ করিয়াছেন। তৎপর কাঁসারী, সুবর্ণবণিক, গন্ধবণিক মধ্যেও ব্যবসায়ে অনেকে বড় হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। এতদ্ভিন্ন নবশাক মাত্রেই স্ব স্ব ব্যবসায় দ্বারা সুখস্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন।

পক্ষান্তরে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, ভদ্রকায়স্থগণ মধ্যে অনেকেই নিঃস্ব। তাহাদের অধিকাংশের চাকুরির উপর নির্ভর। সেই নির্দ্দিষ্ট বেতনে অনেক পরিবারের চলিয়া উঠা দুঃসাধ্য। যাহারা সামান্য বিষয় সম্পত্তি ভোগ করিতেছেন, তাঁহারা অধিকাংশে ঋণ দায়ে আবদ্ধ। দুর্ভিক্ষ সময়ে এই তিন শ্রেণীর মধ্যে অনেককে যেরূপ কষ্ট পাইতে হয়, এমত আর কোন শ্রেণীতে নয়, কারণ ইঁহারা প্রাণান্তে অন্যের নিকট প্রার্থী হইতে চান না।

শস্য।

বিলপ্রধান স্থানে ধানের চাষ অধিক হয়, অপেক্ষাকৃত উচ্চ স্থানে, পাট জন্মিয়া থাকে। তিল, সরিসা, মটর, খেসারী, কলাই মুসুরী, ইক্ষু তরমুজ ফুটী, খিরাই, শশা, নারিকেল, গুবাক, খেজুর, তাল, আম, কাঁটাল এই জেলার ভিন্ন ভিন্ন স্থানে জন্মিয়া থাকে।

যে ক্ষেত্রে যত জল অধিক হয়, ধান্যের ডাট তত বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। ২৮ ফিট গভীর জলে পর্য্যন্ত ধান্য জন্মে। নিম্নে কয়েক প্রকার ধান্যের নাম প্রদত্ত হইল।

১ বাখা ২ লেপা ৩ মহিষকান্দী ৪ বালিয়াবেত ৫ বানসামর্থ ৬ লক্ষ্মীদীঘা ৭ কালকালার ৮ লক্ষ্মীকাজা ৯ লজ্জ ১০ রাজীললজ ১১ কুন ১২ ঝুলাই ১৩ বাঁশবাই ১৪ দুল কচু ১৫ গিলা সইতা ১৬ শেবকন্যা ১৭ জোঙ্কন কর্পূর ১৮ বয়রা ১৯ কালাপুরা ২০ গন্ধকস্তুরি ২১ পিপীরায় (পাতিবাম) ২২ সাইতাম

২৩ কাঁচকলঙ্গা ২৪ বড় দিঘা ২৫ বোর ২৬ খাইঠা শ্রীবইলাম, বাগুনবিচি, রাজা-মেড়ল, হইলনে, কালামাণিক, গরেশ্বর, খইয়া মটর, গইরাকাজলা। মাদারী-পুরের নিকটবর্ত্তী বিশেষ পালং ষ্টেসনের স্থান সমূহে দেশী চাউলের আমদানী অত্যন্ত কম। বাখরগঞ্জের বালামই প্রধান অবলম্বন, তবে অধুনা ব্রহ্মদেশের আতপ চাউলের আমদানী এখানেও প্রচুর হইতেছে। এই আতপ চাউলের আমদানী নিবন্ধন এদেশবাসী এই প্রবল দুর্ম্মূল্যের সময়ে, প্রাণ বাঁচাইতে সমর্থ হইয়াছে। কিন্তু অচিরাৎ যদ্যপি চাউলের মূল্য কোন ক্রমে হ্রাস না পায়, তবে নিশ্চয় অনশনে বহু লোক প্রাণত্যাগ করিতে বাধ্য হইবে।

পাটের চাষ বৃদ্ধির সহিত ধান্যের চাষ ক্রমশঃই লয় পাইতেছে। পাটে প্রচুর লাভ পাইয়া মুসলমান ও নমঃশূদ্র সম্প্রদায় বিশেষ উন্নত হইয়া উঠিয়াছে। তাহাদের অধিকাংশের অবস্থা ভাল। প্রত্যেকেই টিনের ঘরের ব্যবস্থা করিয়া ও গহনা তৈয়ার করিয়া আপনার উন্নত অবস্থার পরিচয় প্রদান করি-তেছে। যাহার জমি জমা নাই কেবল তাহারাই মোট বহিয়া ও কৃষাণের কার্য্য করিয়া দিন পাত করে। চাউলের মূল্য বৃদ্ধি সহ তাহাদের মজুরিও বৃদ্ধি পাইয়াছে। বর্ত্তমান বর্ষে পাটের দর ন্যূন হওয়ায় অনেক মহাজনের ক্ষতি হইয়াছে বটে, কিন্তু চাষীরা তাহা অদ্যাপি অনুভব করিতে সমর্থ হয় নাই। কারণ অধিকাংশ চাষী তাহাদের পাট পূর্ব্বেই মহাজনগণের নিকট বিক্রয় করিয়া ফেলিয়াছে, যাহারা অধিক লাভের আশায় সঞ্চয় করিয়া রাখি-য়াছে, তাহারাই এখন বিপন্ন।

বাস্তবিক পাটের বাজার যদি ক্রমশঃ এইরূপ দুই তিন বৎসর দাঁড়ায়, তবে আর পাট বুনিতে কেহ সাহস পাইবে না। কারণ ধান্য ২।৩ বৎসর গোলাযাত করিয়া রাখা যায়, কিন্তু পাট বৎসরের অধিক থাকিলেই নষ্ট হইতে থাকে, কাজেই মূল্য কমিয়া যায়। পুরান চাউলের দাম বরং অধিক হয়। ক্ষণিক লাভাশয়ে যাহারা ধান্য পরিত্যাগ করিয়া এইরূপ পাটের চাষ করিতেছে, তাহারাই দেশের ধান্য, চাউল দুর্ম্মূল্য হওয়ার প্রধান পথপ্রদর্শক বা সাধারণের শত্রু। ফরিদপুর জেলায় পাটের চাষ ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইয়া ধান্যের চাষ কমিয়া পড়িতেছে। অন্ততঃ ধান্য ও পাট সমভাবে বপন না করিলে, দারুণ দুর্ম্মূল্যের হস্ত হইতে নিস্কৃতি পাইবার আর উপায় নাই। স্বদেশসেবীগণের এ বিষয়ে লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য।

অধুনা স্বদেশী বস্ত্রের আমদানী ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে ; ইহাতে তাঁতি, জুগী, জোলা (কারিকর) দের অবস্থার বহু পরিবর্ত্তন দেখা যায়। কিন্তু মিলের ব্যবস্থা না হইলে, হাতে খাটিয়া প্রতিযোগিতা রক্ষার সম্ভাবনা নাই। স্বদেশী ধনীগণ কোম্পানীর প্রথামত এই ব্যবসায়ের জন্য সেয়ার খুলিলে, দেশের বিশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে এবং উহাতেই তাঁতি, জুগী প্রভৃতি ও বহু দেশীয় দরিদ্র প্রতিপালিত হইতে পারে। কার্পাস বৃক্ষের বৃদ্ধি না করিতে পারিলে, কাপড়ের ব্যবসায়ের উন্নতির সম্ভাবনা নাই, যাহাতে ভাল বীজ বপন করিয়া উৎকৃষ্ট কার্পাস জন্মিতে পারে, তাহার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

আমাদের দেশে পূর্ব্বে নবশাখগণই নানারূপ ব্যবসায় চালাইত। কিন্তু অধুনা ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থগণও ব্যবসায় করিতে লজ্জাবোধ করেন না। দেশের পক্ষে এটী শুভ লক্ষণ। কিন্তু অনেকেরই অর্থ সংস্থাপন নাই, দশজনে মিলিয়া কার্য্য চালাইবার প্রথা আমাদের দেশে প্রচলিত হওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু সাধুতাই উহার প্রধান অবলম্বন। যত দিন আমরা মন খাঁটী করিয়া এইরূপ সাধুতা রক্ষা করিয়া দশজনের কার্য্য একজনে সম্পন্ন না করিতে পারিব তত দিন আমাদের উন্নতির কোন আশা নাই। মোসলমানদের মধ্যে বহুকাল যাবত বাণিজ্য করিবার প্রথা থাকিলেও অতি অল্প লোকই তাহা করিয়া থাকে। চাষই অধিকাংশের জীবিকা।

নিম্নশ্রেণীর মোসলমান ও হিন্দুগণের মধ্যে অনেকে নৌকার মাঝিগিরি করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। ঝালো ও কৈবর্ত্তগণ এই কার্য্যে বিশেষ পটু। মেঘনা, পদ্মা প্রভৃতি প্রবল স্রোতস্বতীর বীচিমালা উল্লঙ্ঘন করিয়া উহারা অনায়াসে পারাপার হইয়া থাকে। কিন্তু নৌবিভাগের নূতন কোন উন্নতির আমাদের দেশে কেহ উদ্ভব করিতে সমর্থ হইতেছেন না। এবিষয়ে মস্তিষ্ক পরিচালন করা কর্ত্তব্য।

বাদিয়া সম্প্রদায় অধুনা মোসলমান ধর্ম্মাবলম্বী। ইহাদের কোন নির্দ্দিষ্ট বাড়ী ঘর নাই। কেবল নৌকাযোগে নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়ায়, স্ত্রী পুরুষে সমভাবে নৌকা চালাইয়া ক্রয় বিক্রয় করিয়া থাকে। নানাবিধ মনোহারি জিনিষ বিক্রয় করাই ইহাদের কার্য্য, হাটে বাজারে ভিন্ন গ্রামে গ্রামে গিয়াও ইহারা ফিরিওয়ালার ন্যায় সাধারণের নিকট মনোহারি দ্রব্য উপস্থিত করিয়া বিক্রয় করে। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ মৎস্য বিক্রয় করিয়াও থাকে। বাস্তবিক ইহারা আমাদের দেশের মধ্যশ্রেণীর ব্যবসায়ী। কিন্তু এই দলের কোন কোন

শাখা চুরি ডাকাইতি করে বলিয়া, পুলিশের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সর্ব্বদাই তাহাদের প্রতি রহিয়াছে। স্বদেশীর প্রতি ইহাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারিলে বিশেষ উপকার সাধিত হইতে পারে।

আমরা একটী উৎকৃষ্ট শিল্পের বিষয় উল্লেখ করি নাই— উহা সাতৈরের শীতল পাটী। ছয় ফুট লম্বা ও ৪ ফুট প্রস্থে একটী পাটীর মূল্য ১৮৬৭ খ্রীঃ অব্দে ১৫০৲ দেড়শত টাকা পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। (মিঃ হুইলের রিপোর্ট দেখ।) এই শিল্পের কতকটা অবনতি ঘটিয়াছে।

এক সময়ে ফতেয়াবাদের স্থপতিকুল বাঙ্গালার নানা স্থানে মঠ ও অট্টালিকা ইত্যাদি নির্ম্মাণ করিয়া দিত। চুপসাবাসা কায়স্থ জাতীয় রাজমিস্ত্রি-গণ এবিষয়ে বিশেষ পটু ছিল। ফতেয়াবাদের কারিকরদিগের নিকট এই রাজদের পূর্ব্বপুরুষ শান্তিরাম দে শিক্ষা লাভ করে।

বর্ত্তমান সময়ে যে সকল শিল্পের উন্নতি হইয়াছে, আমরা পরে তাহা উল্লেখ করিব।

ফরিদপুরের প্রাকৃতিক বিবরণ।

তিনটী জেলার আংশিক সমবায়ে ফরিদপুর জেলার পূর্ণ বিকাশ। তন্মধ্যে ১ম ঢাকা, ২য় যশোহর, ৩য় বাখরগঞ্জ। প্রাচীনত্ব হিসাবে ঢাকার অংশই শ্রেষ্ঠ; অতএব উহার বিবরণই প্রথম উল্লেখ করা কর্ত্তব্য। ঢাকা জেলা হইতে যে সকল স্থান বিচ্ছিন্ন হইয়া ফরিদপুরান্তর্গত হইয়াছে, তন্মধ্যে বিক্রমপুরের দক্ষিণাংশ অতি প্রাচীন স্থান। এতৎসম্বন্ধে জানা যায় যে, ঐ ভূভাগ পূর্ব্বে সমতট বঙ্গের অন্তর্গত ছিল, পরে রাজা বিক্রমাদিত্য কতক কাল ঢাকার দক্ষিণাংশে অবস্থান করায় ঐ অংশ বিক্রমপুর আখ্যা প্রাপ্ত হয়।(১) কেহ কেহ বলেন যে, বিক্রমশালী সেন রাজগণই তাঁহাদের প্রিয় নিকেতনটীকে "বিক্রমপুর" নাম প্রদান করেন। যাহা হউক "বিক্রমপুর" নাম যত দিবসেরই হউক না কেন, সমতট বঙ্গের অন্তর্গত থাকায় উহা যে খ্রীষ্টীয় অব্দারম্ভের পূর্ব্বেই স্থলভাগে পরিণত হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

অতঃপর যশোহর হইতে যে ভূভাগ বিচ্ছিন্ন হইয়া ফরিদপুর জেলার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে, তাহাও কম প্রাচীন নয়। ভূষণা ও ফতেয়াবাদের বিবরণ আমরা মোগল রাজত্বের পূর্ব্ব হইতেই প্রাপ্ত হই। আকবরনামা ও আইন-ই-আকবরিতে ফতেয়াবাদের নাম উল্লেখ আছে। (২) তবে ঐ ভূভাগ কত কালের, তাহা স্পষ্ট অনুমান করা যায় না। কোটালীপাড়ার অন্তর্গত পিঞ্জরী এবং ইদিলপুরের অন্তর্গত সামন্তসার গ্রামের পরিচয় সেনরাজগণের সময় প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহাতে অনুমান হয় যে ফতেয়াবাদ বিভাগ ও তন্নিকটস্থ কতক স্থান অন্ততঃ সহস্র বৎসর পূর্ব্বে নিশ্চয় স্থল ভাগে পরিণত হইয়াছিল।

"সমতট বঙ্গের নিম্ন দিয়া পূর্ব্বে সাগর-স্রোত প্রবাহিত হইত, ক্রমে চড়া পড়িয়া উহা বহুশত ক্রোশ পর্য্যন্ত ভূভাগরূপে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু সম্যক্‌রূপে উহার জল নিঃসরণ না হওয়ায়, কোথাও বা হ্রদাকারে পরিণত হইয়া রহিয়াছে। এ সকল হ্রদ সাধারণতঃ "বিল" নামে অভিহিত। এইরূপ বহু বিলের সমষ্টিতে ফতেয়াবাদ বিভাগের সৃষ্টি হইয়াছে। আরিয়ল-খাঁ নদীর

১ হণ্টার প্রণীত ষ্টেটেসটিকাল একাউণ্ট অব ঢাকা ৭০ পৃষ্ঠা।

২ ইলিয়ট হিষ্টরী অব ইণ্ডিয়া—৩৭ পৃষ্ঠা এবং আকবরনামা ৩য় ভাগ ৫২৭ পৃষ্ঠা।

পশ্চিমপ্রান্ত হইতে মধুমতী নদীর পূর্ব্বতট পর্য্যন্ত যে কোন স্থানে খাল বা পুষ্করিণী খনন করা যায়, সেই স্থানের মৃত্তিকার কিছু নিম্নেই একটা কাল স্তর দৃষ্ট হইয়া থাকে। ভীট দাম পচিয়া যেরূপ মৃত্তিকার সৃষ্টি হয়, উহা সাধারণতঃ, ঠিক তদনুরূপ। এজন্য বোধ হয়, বিস্তৃত বিলের উপর যে সকল ভীট দাম ছিল, কালক্রমে উহাই পচিয়া এইরূপে মৃত্তিকা-রাশির সৃষ্টি হইয়াছে এবং উহাতে ক্রমে স্থলভাগের উদ্ভব হইয়া থাকিবে। এইরূপ বহু বিলের বিলয়ে ফতেয়াবাদ বিভাগের সৃষ্টি হইয়াছে। ফতেয়াবাদের অধিকাংশ অধুনা ফরিদপুর বিভাগের অন্তর্গত। বোধ হয়, ফরিদপুর পূর্ব্বে এই ফতেয়াবাদের অন্তর্গত ছিল" (৩)।

"প্রবাদ আছে, পূর্ব্বে এই স্থান বহু জলা ও জঙ্গলে পরিপূর্ণ থাকায়, কেহই আবাদ করিয়া উঠিতে পারে নাই। পরে ফতে আলি নামে এক মুসলমান বহু আয়াসে, এই স্থানে মনুষ্য-বাসোপযোগী করিয়া উঠাইলে, উহার নাম হয়, ফতেয়াবাদ।

পরে বাখরগঞ্জ জেলা হইতে যে স্থান গুলি খারিজ হইয়া ফরিদপুরের অন্তর্গত হইয়াছে, উহার ঐতিহাসিক তত্ত্বও ঐরূপ। কারণ বাখরগঞ্জের অধিকাংশ স্থান পূর্ব্বে সাগরজলে নিমজ্জিত ছিল, পরে ব্রহ্মপুত্র ও গঙ্গা কর্ত্তৃক উচ্চ ভূপৃষ্ঠ হইতে পঙ্কিল মৃত্তিকা ও প্রস্তররাশি বিধৌত হইয়া স্রোতোবেগে যেস্থানে আসিয়া কতকটা স্থির হইয়া থাকিতে পারিয়াছে, তথায়ই চড়া বা দ্বীপবৎ স্থানের সৃষ্টি হইয়া পড়িয়াছে। বাঙ্গালার "দ্বীপ" "ডাঙ্গা" "কূল" প্রভৃতি যে সকল স্থানের সহিত সংযোগে দেখা যায়, তাহাদের উদ্ভব, প্রায়ই এইরূপ উপায়ে, সংঘটিত হইয়াছে।

আবার ভূকম্প বা অত্যধিক জলপ্লাবন দ্বারাও অনেকরূপ প্রাকৃতিক বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। উহাতে কোন স্থানের অধঃপতন ও কোন স্থানের উন্নয়ন ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে। ভাগীরথী ও পদ্মার মধ্যবর্ত্তী "ব" দ্বীপবৎ ভূভাগে নদীর বিপর্য্যয়ে সময় সময় নানারূপ পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। সমুদ্রোপকূলেই সাধারণতঃ ঘন ঘন পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়।

---

(৩) ১৫৮২ খ্রীঃ অব্দে আকবর বাদসাহের শাসন সময়ে সমস্ত বাঙ্গালা দেশ ৩৩টী সরকারে বিভক্ত হয়। ফরিদপুর মহম্মদ আবুদের সরকারের অন্তর্গত ছিল বলিয়া বোধ হয়। হণ্টার, ষ্টেটিসটিকাল একাউণ্ট অব ফরিদপুর ২৫৩ পৃষ্ঠা।

পূর্ব্ব-দক্ষিণ বঙ্গের নিকট মহাসমুদ্র থাকায় অনেক বড় নদী উহার বক্ষঃ ভেদ করিয়া প্রবাহিত হইতেছে। এজন্য বন্যাদি দ্বারা সমুদ্রজল-বৃদ্ধির সহিত ও নদীর গতি পরিবর্ত্তন সহকারে এ ভূভাগের বিপর্য্যয় প্রত্যেক শতাব্দীতে কিছু না কিছু অবশ্যই হইয়া থাকে। পদ্মার তীরস্থ স্থানগুলির প্রতি দৃষ্টি করিলেই ইহা পরিলক্ষিত হয়। "চাঁদ রায় ও কেদার রায় যখন বিক্রমপুর শাসন করিতেন, তখন উহা কতকগুলি দ্বীপসমষ্টি ছিল মাত্র। ৪)। কোন বৃহৎ নদী বিক্রমপুরের মধ্যে ছিল না, এখন কিন্তু তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত দৃষ্ট হইয়া থাকে। আমরা এস্থলে নদীর গতির পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ প্রদান করিলাম।

প্রবাদ অনুসারে জানা যায়, পদ্মানদী ফরিদপুরের ২৫ মাইল উত্তরে "সেলিমপুর" গ্রামের দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইয়া কানাইপুরের নিকট দিয়া পূর্ব্বমুখে প্রবাহিত হইত। পরে ফরিদপুরের নিম্নস্থ ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী সহ সম্মিলিত হইয়াছিল, পরিণামে ঐ ক্ষুদ্র নদীই প্রবল পদ্মারূপে পরিণত হইয়া উহার পূর্ব্বতন প্রবল খাতটীকে মরা-পদ্মারূপে পরিচিত করিয়াছে। ৬০।৭০ বৎসর গত হইল মধুখালি বন্দরটী চন্দনা নদীর দক্ষিণ-তীরে অবস্থিত ছিল। ক্রমে নদীর গতি পরিবর্ত্তিত হইয়া বন্দরের দক্ষিণ দিক্ দিয়া প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হইলে, বন্দরটী আবার উঠিয়া নদীর দক্ষিণ পারে সংস্থাপিত হয়।

৪৮।৪৯ বৎসর পূর্ব্বে বৈকুণ্ঠপুর চন্দনা নদীর উত্তর পারে অবস্থিত ছিল। কিন্তু নদীর গতি পরিবর্ত্তন হইয়া এখন ঐ গ্রাম নদীর দক্ষিণ পার হইয়া পড়িয়াছে।

পদ্মার পরিবর্ত্তন সর্ব্বাপেক্ষা সমধিক সংঘটিত হইয়া থাকে। অতি পূর্ব্বকালে পদ্মা নদীর মোহনা ঘুরিয়া ফিরিয়া নানা স্থান অতিক্রম করতঃ মেঘনার সহিত সম্মিলিত হইয়াছিল। মিঃ রেনেল ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে পূর্ব্ববঙ্গের যে মানচিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন, তাহাতে দেখা যায়, পদ্মা বিক্রমপুরের বহু পশ্চিম দিক দিয়া প্রবাহিত হইয়া, ভুবনেশ্বর নামক একটী নদীর সহিত মিলিত হইয়া বাখরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত মেহেন্দিগঞ্জ থানার মধ্য দিয়া মেঘনার সহিত সম্মিলিত হইয়াছিল। এখন ভুবনেশ্বর সম্পূর্ণ স্বীয় অস্তিত্ব হারাইয়া "আরিয়ল খাঁ" নাম ধারণ

(৪) হার্ট'এ রেইলি রাল কফিচ, ১১৮।১১৯ পৃষ্ঠা।

করিয়াছে। সাধারণতঃ কন্দর্পপুর মোহানাই পূর্ব্বে পদ্মা ও মেঘনার সম্মিলন স্থান ছিল। তখন "কীর্ত্তিনাশা" বা "নয়াভাঙ্গনী" নামে কোন নদীর পরিচয় ছিল না বিক্রমপুরের অন্তর্গত রাজনগর ও ভদ্রেশ্বর গ্রামের মধ্যে একটা অপ্রশস্ত জলপ্রণালী বর্ত্তমান ছিল। উহা প্রাচীন কালীগঙ্গার শেষ চিহ্ন মাত্র। শ্রীপুর, নওপাড়া, ফুলবাড়িয়া মূলফৎগঞ্জ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ গ্রাম, কালী-গঙ্গার তটেই বিদ্যমান ছিল।* পরে শত বৎসরের মধ্যে কীর্ত্তিনাশা উদ্ভূত হইয়া বিক্রমপুরের মধ্য ভেদ করিয়া এবং নয়াভাঙ্গনী আবির্ভূত হইয়া ইদিলপুরের প্রান্ত দিয়া পদ্মা ও মেঘনাকে পরস্পর সংযুক্ত করিয়াছে।

মূল কথা, ব্রহ্মপুত্র মেঘনার সহিত মিলিত হইয়া যখন প্রবাহিত হইত, তখন উহার স্রোতবেগ অতি প্রবল থাকায়, পদ্মাকে বহু পশ্চিম দিকে রাখিয়াছিল। পরে আবার যখন ব্রহ্মপুত্রের সহিত মেঘনার ততটা সম্বন্ধ রহিল না, ব্রহ্মপুত্র যমুনার সহিত মিলিত হইয়া গোয়ালন্দের নিকট পদ্মার সহিত সম্মিলিত হইল তখন পদ্মার বেগই প্রবল হইয়া দাঁড়াইয়া ক্রমে পশ্চিমদিক পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হইতে লাগিল, তাহার ফল স্বরূপই কীর্ত্তিনাশার ও নয়াভাঙ্গনীর উদ্ভব।

পদ্মার গতি পরিবর্ত্তন অতি বিচিত্র। উহার মধ্যে হঠাৎ এমন সকল চর উৎপন্ন হয় যে কোন ষ্টীমার এক সপ্তাহ পূর্ব্বে যে জল অতিক্রম করিয়া গিয়াছে, পর সপ্তাহে আর সে স্থান অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না। যে স্থানে পূর্ব্বে অল্প জল বিদ্যমান ছিল, উহাই আবার অত্যন্ত গভীর হইয়া পড়িয়াছে, দেখা যায়। তীরস্থ গ্রামগুলি ভগ্ন করিয়া এমন শ্রীভ্রষ্ট করে যে, বৎসরান্তে গ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া নদী-তীর হইতে পরিচিত স্থান ঠিক করিয়া লওয়া সুকঠিন হয়।

পদ্মা নদী কোন সময়ে মধুমতী ও হরিণঘাটার সহিত সম্মিলিত হইবার জন্য, একটী প্রধান শাখা অবলম্বন করিয়াছিল। ইহাতে নদীয়া ও যশোহর জেলার নদীগুলি প্রায়ই বন্ধ হইয়াছে, নৌকাযোগে পূর্ব্বে এই সকল নদী

---

* হণ্টার রেণেলের ম্যাপ ১৮।১১৯ পৃষ্ঠা—রেণেল ম্যাপ এই নদীটাকে কেবল মাত্র গঙ্গা বলিয়া যাওয়ায় শ্রীযুক্ত নিখিল নাথ রায় মহাশয় এটীকে পদ্মা বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। বাস্তবিক তাহা নয়। তৎকালে পদ্মা অপেক্ষা বরং মেঘনা নদী শ্রীপুর গ্রামের নিকটবর্ত্তী ছিল। চরকালীগঙ্গা বলিয়া যে মহালের পরিচয় ফরিদপুরের কালেক্টরের তৌজীতে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা এই কালীগঙ্গারই মহাল। কালীগঙ্গার অধিকাংশ এখন কীর্ত্তিনাশার অঙ্কে বিলীন হইয়া গিয়াছে।

বাহিয়া পশ্চিম বঙ্গে, এমন কি, উত্তর পশ্চিম প্রদেশেও যাতায়াত করা যাইতে পারিত, ষ্টিমার চলাচলেরও বাধা ছিল না। এখন মধুমতী ও হরিণঘাটা অবলম্বনে সুন্দরবনের মধ্য অথবা নিম্ন দিয়া পশ্চিম বঙ্গে যাইতে হয়।

১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে কুষ্টিয়ার নিকট গড়াই নদীর বিস্তারমাত্র ৬০০ শত ফুট ছিল। ১৮৫৪।৫৫ খ্রীষ্টাব্দে যখন *রেভিনিউ আফিসার মিঃ লেম্বারটন কর্তৃক উহার পরিমাপ হয়, তখন ভদ্রখালী হইতে মীরপুর পর্য্যন্ত ইহার প্রসার ১৩২০ ফুট হইয়াছিল। দেখা যায় ২৭ বৎসর মধ্যে উহার শক্তি দ্বিগুণ লাভ করে। এখন আবার গড়াই নদীর উপর দিয়া ইষ্টারণ-বেঙ্গল রেলওয়ে-কোম্পানী কর্তৃক লৌহসেতু নির্ম্মিত হওয়ায়, উহার আকার খর্ব্ব হইয়া আসিতেছে।

পূর্ব্বে গড়াই আকারে অত্যন্ত ক্ষুদ্র ছিল; পদ্মা হইতে মধুমতী চন্দনা নদী হইয়া যাইতে হইত। এখন গ্রীষ্মকালে চন্দনার মোহানা, একেবারে শুষ্ক হইয়া যায়। চন্দনা গড়াই নদীর ২৬ মাইল নিম্নে পদ্মা হইতে বাহির হইয়াছিল। উভয় নদী প্রায় চরম সীমায় উপনীত হইয়াছে।

ফরিদপুর জেলার উত্তর পূর্ব্বাংশে যেরূপ নদী কর্তৃক নানাবিধ পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইয়াছে, পশ্চিম দক্ষিণ-ভাগেও তদনুরূপ বিলের সমষ্টিতে ভিন্ন রূপ দৃশ্য প্রতিফলিত করিয়াছে। জেলার উত্তরাংশ হইতে দক্ষিণাংশ ক্রমশঃই ঢালু হইয়া চলিয়াছে। পরে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বিলের সমষ্টিতে পর্য্যবসিত হইয়াছে। বিলের অধিকাংশ প্রায় জলপূর্ণ থাকিত, অধুনা অনেকটা উচ্চ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ফরিদপুরের নিম্নস্থ ঢোল সমুদ্র একেবারে উচ্চ ভূমিতে পরিণত হইয়াছে। বিলের মধ্যে দিয়া অসংখ্য খালের চিহ্ন দৃষ্ট হওয়ায় প্রতীত হয় যে, এই সকল খাল দিয়া পূর্ব্বে নদীর জল নিঃসৃত হইত, পরে প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ে, নদীর গতি ভিন্ন দিকে পরিবর্ত্তিত এবং খালের মোহানাগুলি উচ্চ হওয়ায় নদীর সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। বর্ষার সময়ে এই সকল বিলগুলি প্রায় সাগর শাখাতে পরিণত হয়। যে সকল বিলে একেবারেই শস্য অথবা ধাপ থাকে না, প্রবল বাতাসের সময় নৌকা যোগে ঐ সকল স্থান অতিক্রম করিতে বড়ই কষ্ট পাইতে হয়।

প্রাচীন ইতিহাস।

বিক্রমপুর ও সেন রাজবংশ।

যে সুপ্রসিদ্ধ সেনরাজগণ বঙ্গে অবস্থান করিয়া, ভারতের নানাস্থানে রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন; যাঁহারা কান্যকুব্জ হইতে পঞ্চ সাগ্নিক বিপ্র আনয়ন করিয়া, বঙ্গে প্রথমতঃ শ্রৌত যজ্ঞকার্য্যের অবতারণা করেন; যাঁহাদের নিকট ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থ কুলোৎপন্ন গুণিগণ কৌলীন্য মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; এবং যাহাদের শাসনপ্রভাবে দুষ্ট দমিত ও শিষ্ট পালিত হওয়ায় বঙ্গে শান্তি সংস্থাপিত হইয়াছিল, সেই রাজাদের বাসস্থান বিক্রমপুরে ছিল। বিক্রমপুরের আলোচনা করিতে হইলে সেন রাজাদিগের কথা প্রথমেই মনে পড়ে। সুতরাং তাহাদের বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা পাঠকের বিরক্তিকর হইবে না। অপর চাঁদরায় ও কেদার রায়, পরে বিক্রমপুরের আধিপত্য লাভ করিয়া বাদসাহের প্রতিকূলে অস্ত্রধারণ করিতেও পশ্চাৎপদ হয় নাই; এই কারণে বাদসাহের প্রেরিত সেনাপতি রাজপুত বীর মানসিংহের বিক্রমপুর পর্য্যন্ত আগমন করিতে হইয়াছিল। অতএব এইরূপ প্রসিদ্ধ স্থান সম্বন্ধে কিছু বলিলে বোধ হয় বঙ্গবাসী মাত্রেই উহা শুনিতে কতকটা ইচ্ছা প্রকাশ করিবেন। আমরা এই সাহসের উপর নির্ভর করিয়া বিক্রমপুরের কিঞ্চিৎ ঐতিহাসিক তথ্য প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

বঙ্গদেশের অন্তর্গত বিবিধ প্রদেশের তুলনায় বিক্রমপুর অতি প্রাচীন স্থান। যখন গৌড়, নবদ্বীপ, সোণারগাঁ, সপ্তগ্রাম, প্রভৃতি স্থানগুলির নাম জনগণের শ্রুতিগোচর হয় নাই, তৎপূর্ব্বে বিক্রমপুরের পূর্ণ বিকাশ। ঢাকা, বর্দ্ধমান, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি স্থানগুলি বিক্রমপুরের বহু পরে বিকাশ পাইয়াছে।

নবম শতাব্দী পর্য্যন্ত বঙ্গোপসাগরের তীরব্যাপী কতকগুলি স্থান "সমতট" নামে বলিয়া পরিচিত ছিল। তখন বিক্রমপুর এই সমতট আখ্যা প্রাপ্ত স্থানের অন্তর্গত ছিল। বর্ত্তমান সময়ে আমরা সমুদ্রতীর পর্য্যন্ত যে স্থানগুলি অবলোকন করি, সমতট আখ্যা প্রাপ্তির সময়ে উহার অধিকাংশ স্থান জলগর্ভ হইতে উত্থিত হয় নাই। মিঃ বিভারেজ কৃত বাখরগঞ্জের ইতিহাস পাঠ করিয়া জানা যায় যে, বিক্রমপুরের দক্ষিণ ভাগে বিস্তৃত জলরাশি বর্ত্তমান থাকিয়া

দক্ষিণ বঙ্গকে একরূপ নিমগ্ন করিয়া রাখিয়াছিল। মধ্যে মধ্যে দুই একটী দ্বীপবৎ স্থান মাত্র লোকলোচনের আয়ত্ত হইত। এইরূপ চড়া পড়িয়া ইদিলপুর, চন্দ্রদ্বীপ, সাহাবাজপুর, হাতিয়া, সনদ্বীপ প্রভৃতি স্থানের উৎপত্তি হয়। নবদ্বীপ অগ্রদ্বীপ প্রভৃতি স্থানগুলির উৎপত্তিও পরে হইয়াছে। মিনহাজ-ই সিরাজ তাঁহার "তবকতই নাসিরি "গ্রন্থে এই সমতটকে কোন স্থানে "সনকট" কোথাও "সকাট" বা "সাকাট" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে প্রথম সমতট নামের উল্লেখ প্রাপ্ত হওয়া যায়। উত্তরে ব্রহ্মপুত্র বা লৌহিত্য নদ, পূর্ব্বে মেঘনা নদ, দক্ষিণে বঙ্গ অখাত, পশ্চিমে ভাগীরথী, এই চতুঃসীমান্তর্ব্বর্ত্তী স্থান সমতট নামে কথিত হইত।

হিউএন সাহের সময়ে বঙ্গদেশের যে কয়েকটী বিভাগ দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে সমতটের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়।

বৈদ্যবংশীয় রাজা আদিশূর * বিক্রমপুরান্তর্গত রামপাল নামক স্থানে বৃহৎ যজ্ঞের আয়োজন করিয়া, কান্যকুব্জ হইতে পঞ্চজন ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন। এই সকল বিপ্রেরা যোদ্ধৃবেশে আগমন করায়, রাজা বিরক্ত হইয়া তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন না। কিন্তু বিপ্রগণ বুঝিতে পারিলেন যে, রাজা তাঁহাদের বেশভূষার প্রতি লক্ষ্য করিয়াই বিরক্ত হইয়াছেন, অতএব তাঁহাকে ব্রাহ্মণ্যপ্রভাব দেখাইবার ব্যপদেশে তাঁহারা মৃত মল্লকাষ্ঠে আশীর্ব্বাদী পুষ্প

---

* অম্বষ্ঠকুলসম্ভূত আদিশূরো নৃপেশ্বরঃ।
রাঢ়গৌড়বরেন্দ্রাশ্চ বঙ্গদেশস্তথৈবচ।
এতেষাং নৃপতিশ্চৈব সর্ব্বভূমীশ্বরো বলী।
অমাত্যৈর্বান্ধবৈশ্চৈব মন্ত্রিভির্দ্বিজবৃন্দকৈঃ।
এতৈঃ সহ মহীপাল একদা স নিজালয়ে।
উপবিষ্টো দ্বিজান্ পৃষ্টঃ ধর্ম্মশাস্ত্রপরায়ণঃ।
ইতি দেবীবর ঘটককারিকা ২য় সংস্করণ
শব্দকল্পদ্রুম, ৭১২ পৃষ্ঠা।

অথ গৌড়দেশে কেন প্রকারেণ ব্রাহ্মণাগমনং তৎশৃণু। অথ সকলদিগ্দেশীয়রাজমধ্যে কলিযুগাবতার ইব নিখিল মঙ্গলালয়ঃ শ্রীলশ্রীআদিশূরো নাম রাজাসবৈদ্যকুলোদ্ভবঃ পরমধার্ম্মিক আসীৎ। ইত্যাদি। বারেন্দ্র ঘটক কারিকা; ৺রামধন তর্কপঞ্চানন মহাশয় অতি প্রাচীন ও প্রামাণ্য কুলজিগ্রন্থ হইতে এই শ্লোকটী এবং অপর একটী শ্লোক সংগ্রহ করিয়াছিলেন। অপর শ্লোকটী পাঠে জানা যায় আদিশূর রাজার কন্যার কুলে বল্লাল সেন জন্মগ্রহণ করেন।

(যাহা রাজাকে প্রদান করিবার জন্ত আনিয়াছিলেন) স্থাপন করিলেন ; দেখিতে দেখিতে শুষ্ক কাষ্ঠ পুনরুজ্জীবিত হইয়া, পত্রপুষ্পে পরিশোভিত হইয়া উঠিল। অনুচরেরা রাজাকে এই বিস্ময়কর বিষয় অবগত করাইল। আদিশূর তখন স্বীয় অবিমৃষ্যকারিতার জন্ত ম্রিয়মাণ হইয়া স্বয়ং অগ্রসর হইয়া ব্রাহ্মণদিগকে নানারূপ স্তব স্তুতিবাদে সন্তুষ্ট করিলেন। পরে তাঁহাদিগকে রাজভবনে আনিয়া ঈপ্সিত কার্য্যান্তে বহু পরিমাণে ধন রত্ন প্রদান করিলেন।

বিক্রমপুরের পূর্ব্বোত্তর প্রান্তে মেঘনা নদীর পশ্চিম তটে রামপাল নামক গ্রাম অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে, উহা ঢাকা জেলার অন্তর্গত মুন্সীগঞ্জ সবডিবিসনের অধীন। এই স্থানে প্রায় দুই মাইল দীর্ঘ এক প্রকাণ্ড দীর্ঘিকার খাত বর্ত্তমান আছে। কেহ কেহ বলেন যে, রামপাল নামীয় কোন রাজা কর্ত্তৃক এই জলাশয় খনিত হওয়ায়, তাঁহার নামানুসারে স্থানের নাম রামপাল হইয়াছে। এই স্থানে কতকগুলি ইষ্টকস্তূপ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। কতকগুলি দেব দেবীর প্রতিমূর্ত্তি এখানে মৃত্তিকা গর্ভে পাওয়া যায়, সেগুলি সম্প্রতি ঢাকা নগরীতে রক্ষিত হইয়াছে। এই সকল কারণে প্রতীতি হয়, পূর্ব্বকালে এই স্থানে এক জন পরাক্রমশালী রাজার রাজধানী ছিল। আরও প্রবাদ যে, পূর্ব্বে অনেক ইতর লোক বনে কাষ্ঠ কর্ত্তন করিতে গিয়া, কি মাঠে হলচালনকালে এই স্থানে অনেক স্বর্ণ, রৌপ্য ও বহুমূল্য প্রস্তরাদি প্রাপ্ত হইয়াছে। একবার ৮০ হাজার টাকা মূল্যের একখণ্ড হীরক এই স্থানে পাওয়া গিয়াছিল।* সেনরাজগণের সুবিশাল ও পরাক্রান্ত রাজ্য যদিও বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে,কিন্তু তাঁহাদের বাসস্থান বর্ত্তমান থাকিয়া আজিও তাহাদের মহৈশ্বর্য্যের ও কীর্ত্তির চূড়ান্ত নিদর্শন লোকপরম্পরায় স্মরণ করাইয়া দিতেছে।

সেনরাজগণ সম্বন্ধে আজ কাল বড়ই গোলযোগ চলিতেছে, পূর্ব্বে তাঁহারা এই দেশে বৈদ্য বলিয়াই বিখ্যাত ছিলেন। সম্প্রতি কেহ তাঁহাদিগকে ক্ষত্রিয়, কেহ কেহ বা কায়স্থ প্রমাণ করিতে বিশেষ বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। নানাবিধ তাম্রশাসন ও প্রস্তর ফলক নিত্য নূতন আবিষ্কৃত হইয়া, তাহার সাক্ষী স্বরূপ আবির্ভূত হইতেছে। ঐ সকল শাসনে কি ফলকে যে যে শ্লোকাবলী অঙ্কিত রহিয়াছে, তাহার অর্থ লইয়াও বাদানুবাদ চলিতেছে। বিশেষ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ঐ সকল মূল শাসনপত্র অনেকগুলিই পাওয়া যায় না আবার তাঁহাদের সময় ও বংশাবলী লইয়া অন্ত দিকে তুমুল সংগ্রাম বাধিয়াছে।

* রামপালের বিবরণ দেখ। Taylor's Topography of Dacca.

এ পর্য্যন্ত আমরা শুনিয়া আসিতেছিলাম, বল্লালের অধস্তন সপ্তম কি অষ্টম পুরুষে লক্ষ্মণ বা লাক্ষ্মণীয়া মুসলমান ভয়ে নবদ্বীপ পরিত্যাগ করিয়া, পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে পলায়ন করেন। কিন্তু সম্প্রতি আবার ইতিহাস পাঠ করিয়া জানিতেছি, মুসলমানগণ বল্লাল পুত্র লক্ষ্মণ সেনের সময়েই বঙ্গ বিজয় করিয়াছিলেন। পলায়িত রাজা প্রথমতঃ পুরুষোত্তমে, তৎপশ্চাৎ তাঁহার জ্ঞাতিদের রাজ্য বিক্রমপুরে, আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। "১১৮১ শকাব্দে (১২৬৭ খ্রীঃ) যখন মিনহাজ স্বীয় গ্রন্থ প্রকাশ করেন, তখন তিনি লিখিয়াছেন যে, লক্ষ্মণ সেনের উত্তর পুরুষগণ অদ্যাপি বঙ্গদেশ শাসন করিতেছে। তৎপর "তওয়ারিখ ফিরোজসাহী" লেখক "জই বারণি" লিখিয়াছেন (১২৮০ খ্রীষ্টাব্দে) সুলতান "বুলবন" যখন বিদ্রোহী শাসনকর্ত্তা মুঘিসুদ্দিন তুগ্রলকের পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া আজনগর (ত্রিপুরা) অভিমুখে যাইতেছিলেন, সেই সময় বঙ্গেশ্বর দনুজ রায় সম্রাটকে যথোচিত সাহায্য করিয়াছিলেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে, লক্ষ্মণ সেন নদীয়া হইতে পালাইলে পরও. ৭৫ বৎসর এই রাজ্য তাঁহার উত্তর পুরুষের হস্তগত ছিল।"

নিতান্ত ক্ষোভের বিষয় এই যে, আজ কালকার ঐতিহাসিক গবেষণার দ্রুব পরিমাণ বুঝিতে আমরা যথার্থই অক্ষম। যে সকল মহাশয়েরা এত পরিশ্রম করিয়া উল্লিখিত কথাগুলি সংগ্রহ করিয়াছেন, তাঁহাদের তালিকায় বল্লালের অধস্তন অষ্টম পুরুষে মহারাজ লক্ষণ সেন দেবের সময় বঙ্গদেশ মুসলমান করকবলিত হইয়াছিল, স্পষ্ট উল্লেখ আছে ; অ জ কি না তাঁহাদের মতও পরিবর্ত্তিত হইয়া বল্লাল পুত্র লক্ষ্মণের সমকালেই বঙ্গে প্রথম মুসলমানাধিপত্য স্থাপন স্থিরীকৃত হইতেছে। আরও আশ্চর্য্যের কথা, যেমন আদিশূরের নামান্তর বীরসেন ধরিয়া লইয়া একটা প্রমাণের স্থ ন বিশুদ্ধ করিয়া লওয়া হইয়াছে, তেমন আবার "দনুজ মাওধাকে" দনুজমর্দ্দন ঠিক করিয়া, চন্দ্রদ্বীপের রাজসিংহাসনে উপবেশন করাইতেও কম অনুষ্ঠান করা হয় নাই ; কারণ চন্দ্রদ্বীপের রাজবংশ কায়স্থ দে বংশ। বল্লাল সেনের নামের পশ্চাতে এই দেব উপাধি সংযোগ করিয়া এইজন্ত এতকাল লেখাপড়া চলিয়াছিল। পরে একেবারে তাঁহারা বিক্রমপুরের জীর্ণ সিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া বাকলার নূতন সিংহাসনে গিয়া উপবেশন করিলেন। ইহা অপেক্ষা লেখক মহাশয়েরা যদি ঘৃতকৌশিক গোত্রীয় দে-উপাধিধারী চাঁদ রায় ও কেদার রায়কে সেনবংশীয় বলিয়া পরিচয় প্রদান করিতেন, তবে বরং অধিক সঙ্গত বোধ হইত। বিক্রমপুর মুসলমানকরতল-

গত হইলে বাকলা বা চন্দ্রদ্বীপ যে স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছিল, এই কষ্ট কল্পনা না করাই সুসঙ্গত।

যাহা হউক, সেনরাজগণ মধ্যে লক্ষ্মণ সেন আপনাকে বিক্রমপুরবাসী বলিয়া স্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছেন।* আজকাল আবার স্থানমাহাত্ম্য বৃদ্ধি করিবার আশায় কেহ কেহ গৌড়নগরকে সেনরাজগণের সর্ব্বপ্রথম রাজধানী বলিয়া নির্দ্দেশ করিবার জন্য যথেষ্ট আয়াস স্বীকার করিতেছেন। রামকে শ্যাম, জলকে স্থল, বানান আজকালকার ঐতিহাসিক গবেষণার একটা অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কেহ দেখিয়া, কেহ বা না দেখিয়া ঢিল ছুড়িতেছেন, যেটা যথায় গিয়া পড়ুক না কেন।

সেনরাজগণ বিক্রমপুরবাসী ছিলেন, হয়ত রাজকার্য্যের সুবিধার জন্য তাঁহারা গৌড়দেশেও একটা রাজধানী করিয়া, তথায় সময় সময় অবস্থিতি করিতেন। তৎপর তথা হইতে গঙ্গাতীরে নবদ্বীপে রাজধানী সংস্থাপিত হয়। কৌলীন্য মর্য্যাদা বিক্রমপুর হইতেই সর্ব্বপ্রথমে বিতরিত হয়; তৎপর কেন যে সদ্‌বংশজগণ বিক্রমপুর পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন, তাহা অবধারন করিতে গেলে বল্লাল সম্বন্ধে কতকগুলি দোষারোপ করিতে হয়। গোপালকৃষ্ণকবীন্দ্রবল্লভকৃত অম্বষ্ঠসম্পাদিকাতে বল্লালের দোষের বিষয় উল্লেখ আছে; কিন্তু অন্য কোন কুলজি লেখকেরা তদ্বিষয়ে কিছু বলেন নাই। আমরা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম বারেন্দ্রকায়স্থকুলপঞ্জিকাকার (ঢাকুরে) কবীন্দ্রবল্লভকৃত গ্রন্থের বহুপূর্ব্বে তদ্‌বিষয়ের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তথাপি বৈদ্যজাতি এই অপবাদের সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া নিন্দিত হইয়াছেন। নিম্নে বারেন্দ্র কুলপঞ্জিকার এই কথাগুলি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। যথা—

"একদিন রাজা গেলা মৃগয়া করিতে।
ঝড় বৃষ্টি দুর্য্যোগ হইল আচম্বিতে॥
ত্যজিয়া বিপিন রাজা গেলা লোকালয়ে।
তথায় বসতি করে ডোমের আলয়ে॥

---

* মজিলপুর ২৪ পরগণা তাম্রশাসন প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাতে উল্লেখ আছে যথা—

"সখলু বিক্রমপুর সমাবাসিত জয়স্কন্ধ বীরা মহারাজাধিরাজঃ শ্রীবল্লাল সেন পাদানুধ্যাতাৎ পরমেশ্বর পরমবীরসিংহ পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজঃ লক্ষ্মণদেবঃ ইত্যাদি।

সেই রাত্রি তথায় রহিল উপবাসী।
মিলিলেক ডোমকন্যা প্রাতঃকালে আসি

* * * *

বিবাহ করিব বলি লইয়া আইলা।
যেবা শুনে যেবা জানে শত নিন্দা কৈলা॥
যদি কালক্রমে রাজা শুনে নিন্দাবাণী।
সর্ব্বস্ব হরিয়া তারে তাড়ায় তখনি॥

* * * *

এত বলি রাজসুত মন দুঃখ পেয়ে।
চলিল পিতার কাছে ক্রোধান্বিত হয়ে॥

* * * ”

জলের দৃষ্টান্তে বলে রাজাকে বচন।
পরম পবিত্র হইয়া নীচেতে গমন॥
ইঙ্গিতে বুঝিয়ে রাজা কহে প্রত্যুত্তর।
হস্তীকে ভ্রমর হয়ে দিলেক ঝঙ্কার॥
অনেক ভাবিয়া রাজা বিবাহ না কৈল।
তথাপি ডোমের কন্যা ছাড়িতে নারিল॥

এই উপলক্ষ করিয়া বল্লাল ও লক্ষ্মণ সেনের মধ্যে কয়েকটী শ্লোক লেখালেখি হয়, তাহাও বারেন্দ্রকায়স্থকুলপঞ্জিকা "ঢাকুরে" স্পষ্ট উল্লেখ আছে।

কি জন্য সদ্বংশজাত ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থগণ বিক্রমপুর পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন, তৎসম্বন্ধে ১৩০৫ সনের কার্ত্তিক মাসের নির্ম্মাল্য পত্রিকায় যাহা লিখিয়াছিলাম, তাহা এই স্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"বহুকাল যাবৎ বিক্রমপুর উৎকৃষ্ট বৈদ্যগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছিল। প্রবাদ, বৈদ্য রাজা বল্লাল সেন ও তৎপুত্র লক্ষ্মণ সেনের পরস্পর সংঘর্ষণে সদ্বংশজ বৈদ্যেরা বিক্রমপুর পরিত্যাগ করিয়া সুদূর পঙ্ককূট প্রদেশে প্রস্থান করেন। রাজা আদিশূরের এবং বল্লাল সেনের সমকালে যদিও উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণ বৈদ্য, কায়স্থ প্রভৃতি দ্বারা বিক্রমপুর পরিপূর্ণ ছিল, তথাপি তৎপর হইতে নানা কারণে ঐ সকল বংশসম্ভূত কুলীনসন্ততিগণ বিক্রমপুর পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। এই জন্য ব্রাহ্মণ মধ্যে রাঢ়ী বারেন্দ্র; বৈদ্যদিগের মধ্যেও রাঢ়ী, বঙ্গজ

পঞ্চকূট, বরেন্দ্র; এবং কায়স্থগণ মধ্যে রাঢ়ী, বারেন্দ্র, বঙ্গজ প্রভৃতি সমাজের সৃষ্টি হয়। এইটী নিঃসন্দেহ যে, কৌলীন্য প্রথা প্রথমতঃ বিক্রমপুর হইতেই প্রচারিত হইয়াছিল, তৎপর নানা কারণে কেন যে এইরূপ বিপ্লবের সূত্রপাত হয়, তাহা অবধারণ করা সুকঠিন। তবে কোন কোন বৈদ্যকুলপঞ্জিকা এবং বারেন্দ্র কায়স্থকুলপঞ্জিকা (ঢাকুর) প্রভৃতি পাঠে অবগত হওয়া যায়, যে বল্লালের কতকগুলি দোষনিবন্ধন সামাজিকগণ বিক্রমপুর পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। অথবা বোধ হয় স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বহুসংখ্যক হিন্দু গঙ্গাতীর আশ্রয় করিয়াছিল, তন্নিবন্ধনও বা বিক্রমপুরের এইরূপ শোচনীয় দশা সংঘটিত হইয়া থাকিবে।"

উল্লিখিত কারণ ভিন্ন, উহার আর একটী প্রধান কারণ রাজধানী পরিবর্ত্তন। যখন গৌড়ে রাজধানী স্থাপিত হইল, তখন অনেক লোক রাজধানীতে ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে অবস্থান করিতে আরম্ভ করিল। পরে যখন নবদ্বীপে নূতন রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হইল, তখন তথায় ক্রমে বহু জনগণ বাড়ী ঘর করিয়া অবস্থিতি করিতে আরম্ভ করিল এবং গঙ্গাতীর বলিয়া সেইস্থান ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানগুলি বহুসংখ্যক হিন্দুর আবাসস্থানে পরিণত হইল। কেবল তীর্থ বলিয়া তথায় এত লোকের সমাগম হইয়াছিল না। রাজধানীর সন্নিহিত ও তীর্থ, এই দুই উপলক্ষ করিয়া পূর্ব্ববঙ্গের অধিকাংশ হিন্দু গঙ্গাতীর ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানগুলিতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। বল্লালসেনের কতকটা অসদাচরণ যে উহার কথঞ্চিৎ পরিপোষক হইয়া উঠিয়াছিল, তদ্বিষয়েও সন্দেহ নাই।*

---

* আর এক সমস্যা সেনরাজগণের ও আদিশূরের এতদিন বিক্রমপুর রাজধানী ও যজ্ঞ স্থান বলিয়াই সাধারণের বিশ্বাস ছিল, অধুনা পশ্চিম ও উত্তর বঙ্গবাসী কেহ কেহ গৌড়ে রাজধানী ও যজ্ঞ কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল বলিয়া প্রমাণ করিতে উদ্যোগী। কিন্তু সেন রাজগণের জাতিত্বের প্রমাণের ন্যায় এই সকল প্রমাণেরও যে বিশেষ কোন মূল্য আছে, তাহা আমাদের বোধ হয় না। এখন একটা প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাই যখন ২।৩টা আড্ডা স্থাপন করিয়া এক এক সময়ে এক এক স্থানে অবস্থান করেন, তখন একটা স্বাধীন নৃপতির পক্ষে কি উহা অসম্ভব? আমাদের বিশ্বাস, তখন স্বাস্থ্যরক্ষা হইতে ধর্ম্মের প্রতি লোকের টান অধিক ছিল, এইজন্য ব্রহ্মপুত্রের সন্নিকটে বিক্রমপুর, ভাগীরথীর তীরে নবদ্বীপ এবং করতোয়া তীরে গৌড়ে পৃথক্ তিনটী রাজধানী সংস্থাপিত হয়। আদিশূরের যজ্ঞ বিক্রমপুরে হওয়ার প্রবাদ এক নিশ্বাসে উড়াইয়া দিলে চলিবে না।

আদিশূর ও সেনরাজগণের সময় লইয়া বড়ই গোলমাল চলিতেছে। কেহ বলিতেছেন, পাঁচটা তিন মিনিট দুই সেকেণ্ডের সময়, লক্ষ্মণ সেন সিংহাসনচ্যুত হন এবং বঙ্গে যবনাধিকার আরম্ভ হয়;—কেহ বলেন, তোমার গণনা শুদ্ধ হয় নাই। আমি সিদ্ধান্ত করিয়া দেখিয়াছি, চারি ঘটিকা পৌনে তিন মিনিটের সময় লক্ষ্মণ সেন খিড়কীর দরজা অতিক্রম করিয়া পুরুষোত্তম প্রস্থান করিয়াছিলেন, তখনই প্রকৃতরূপে যবনাধিকার আরম্ভ হইয়াছিল,এই ত নানা মুনির নানা মত। এইরূপ সন তারিখ লইয়া যখন নানারূপ গোলযোগ অদ্য পর্য্যন্ত চলিতেছে, তখন তৎসম্বন্ধে কোন কথা না বলিয়া, সেনরাজগণের রাজত্বের কাল নির্ণয় সম্বন্ধে এই মাত্র বলিতে পারি যে, তাঁহারা নবম শতাব্দীর অন্তভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্য্যন্ত নির্ব্বিবাদে বঙ্গদেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহাদের উত্তর পুরুষে আরও কয়েক জন পূর্ব্ব-বঙ্গে রাজত্ব করিয়াছিলেন, তৎপর তাঁহাদের রাজ্যের অবসান হয়। ত্রয়োদশ হইতে আরম্ভ করিয়া পঞ্চদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত বিক্রমপুরের চরম পতন হয়, তখন মুসলমান শাসনকাল—পাঠান বংশ দেশের রাজা, তাহারা পূর্ব্ববঙ্গের রাজধানী বিক্রমপুর হইতে সোণারগাঁয়ে স্থানান্তরিত করেন।

আইন ই-আকবরি গ্রন্থ পাঠে জানা যায়, মোগল শাসন সময়ে সরকার সোণারগাঁয়ের অন্তর্গত নিম্নলিখিত পরগণাগুলি ছিল, যথা—১ অবতার সাহপুর, ২ আনচাপ, ৩য় অবতার ওসমানপুর, ৪ বিক্রম-পুর, ৫ বেলা জোওয়ার, ৬ বলদাখান, ৭ বোয়ালিয়া, ৮ পারচাঁদে, ৯ বাটখারা, ১০ পলাশবাড়ী, ১১ চরদিয়া, ১২ ফুলরী, ১৩ পানহাটী, ১৪ ভাতরা, ১৫ তাজপুর, ১৬ তিরকী, ১৭ যোগীদিয়া, ১৮ জেওয়ার বন্দর, ১৯, চোকেন্দী,২০ চণ্ডীহার,২১ চাঁদপুর,২২ হাবেলী সোণারগাঁ মক্ত সহর,২৩ খিজির-পুর, ২৪ দোগায়,২৫ ভানডেরা,২৬ দক্ষিণ সাহপুর,২৭ দেওয়ানপুর, ২৮ দেকান ওসমানপুর,২৯ রায়পুর, ৩০ সুধারগঞ্জ, ৩১ সুকেরী, ৩২ সোলিমপুর, ৩৩ সেলি-সেবি, সর জলকর, ৩৪ সুকাওশা,৩৫ সুকদিয়া, ৩৬ সেবারচল, ৩৭ শমসপুর,৩৮ কড়াপুর, ৩৯ গবদী, ৩০ কাত্তিকপুর, ৪১ কাঁদী, ৪২ কোলহরি, ৪৩ ঘাটাদুনাই, ৪৪ মারকোর, ৪৫ মজমপুর, ৪৬ মেহার, ৪৭ মনোহরপুর,, ৪৮ সাহীজল, ৪৯ নরায়ণপুর, ও সায়র জেকাত, ৫০ লেপুরাকোট, ৫১ হিমতীবাজু, ৫২ হাট-ঘাটী, এই বাবার মহলের রাজস্ব ১০,৩৩,১৩,৩৩৩ দাম। তন্মধ্যে বিক্রমপুর



পরগণার রাজস্ব ৩৩,৩৫,০৫২ দাম* অর্থাৎ সমগ্র মহাল মধ্যে বিক্রমপুরের রাজস্ব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ছিল দেখা যায়। সম্প্রতি কার্ত্তিকপুরবাসীরা আপনাদের বসতির পরিচয় স্থলে বিক্রমপুরের নামোল্লেখ করিয়া থাকে, বাস্তবিক কার্ত্তিকপুর একটী পৃথক্ পরগণা বলিয়া বহুকাল যাবৎ উল্লেখ দেখা যায়। মহালের নাম গণনায় পাঠকগণ দেখিবেন উপরে কার্ত্তিকপুরকে পৃথক ধরা হইয়াছে। উহার বার্ষিক কর ৮০,০০০ হাজার দাম। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পঞ্চম রিপোর্টেও দুটী পৃথক পরগণা বলিয়া বিক্রমপুর ও কার্ত্তিকপুরের উল্লেখ দেখা যায়। উপরে যে সকল মহাল বা পরগণার নামোল্লেখ করা হইয়াছে, উহার অধিকাংশ অধুনা ঢাকা, ফরিদপুর, ত্রিপুরা, নোয়াখালী, এই চারি জেলাতে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। কার্ত্তিকপুর ও বিক্রমপুরের কতকাংশ ফরিদপুর জিলার অন্তর্গত, বিক্রমপুরের অধিকাংশ ঢাকা জিলার অন্তর্গত। *

বিক্রমপুর, কার্ত্তিকপুর ও চাঁদপুর সরকার সোনারগাঁয়ের অন্তর্গত এবং ইদিলপুর সরকার বাকলার অন্তর্গত এবং সন্দীপ ও সাবাজপুর সরকার ফতেয়াবাদের অন্তর্বর্ত্তী ছিল। এখন যেমন এক এক জমিদারের জমিদারী বিভিন্ন জিলায় আছে, তখনও তদ্রূপ একজন জমিদারের জমিদারী হয়ত পৃথক্ পৃথক্ সরকারের অন্তর্গত থাকিত। প্রত্যেক সরকারের তহশীলদারকে (দেওয়ানকে) তদন্তর্গত মহালের জন্য পৃথক্‌ভাবে রাজস্ব প্রদান করিতে হইত। আকবরের সময় বিক্রমপুরে চাঁদরায়ের অভ্যুদয় হয়। তাঁহার নামানুসারে চাঁদপুরের নামকরণ হয়, চাঁদপুর বর্ত্তমান সময়ে ত্রিপুরা-জিলার একটী সবডিবিসন, মেঘনা নদীর পূর্ব্বতীরে অবস্থিত। চাঁদরায় বিক্রমপুর, কার্ত্তিকপুর, চাঁদপুর, সরকার সোনারগাঁয়ের অন্তর্গত এই তিন মহালের আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন। ইদিলপুর তখন একটী চড়া স্থান মাত্র ছিল, উহা এবং সাহাবাজপুর ও সন্দীপ পরে কেদার রায়ের হস্তগত হয়। কারণ ইয়োরোপীয় ভ্রমণকারী যে রালফফিস্ ১৫৮৬খ্রীঃ অব্দে যখন এ দেশে আগমন করেন, তখন পর্য্যন্ত সন্দীপ মোগল রাজগণের করায়ত্ত হয় নাই। মোগলেরা উহা হস্তগত করিলে পর ঐ স্থান কেদার রায়ের নিকট গচ্ছিত হয়।

অধুনা বিক্রমপুর ও মাদারিপুরের অন্তর্গত সম্প্রতি যে অবস্থায় পরিণত

---

* তাম্র মুদ্রাবিশেষ—চল্লিশ দামে এক টাকা

* মিঃ বিভারেজ কৃত বাখরগঞ্জের ইতিহাসের সাধারণ বিবরণ দেখ

হইয়াছে, শত বৎসর পূর্ব্বে উহার স্থানীয় অবস্থা এতদপেক্ষা বহু উৎকৃষ্ট ছিল। কীর্ত্তিনাশা তৎকাল পর্য্যন্ত উদ্ভূত হইয়া বিক্রমপুরের বক্ষ বিদারণ করিয়া তাহাকে শ্রীহীনা করিয়া ফেলিয়াছিল না। নয়াভাঙ্গনী বা আরিয়লখাঁ ও বহু স্থানের বিলয় সাধন করে নাই। জনপূর্ণ-শ্যামল-শস্যরাজি-পরিবৃত জনপদ সকল তখন লোকলোচনের যথেষ্ট আনন্দ বর্দ্ধন করিত। মৎস্যপরিপূর্ণ ঝিল ও বিলগুলি নানাবিধ মৎস্য দানে রসনার তৃপ্তিবিধানে সতত নিযুক্ত থাকিত। বিলোৎপন্ন দাম ও তৎপার্শ্বস্থিত প্রশস্ত ক্ষেত্রোৎপন্ন ঘাসগুলি ভক্ষণ করিয়া গাভীগুলি যথেষ্ট হৃষ্টপুষ্ট হইয়া অমৃতনিভ সুস্বাদু দুগ্ধ প্রদান করিয়া জনগণকে পরিপোষণ করিত। তত্রত্য অধিবাসীরা তৎকালে চাউল, মৎস্য, দুগ্ধ যথেষ্ট পরিমাণে প্রাপ্ত হইয়া, স্ব স্ব পরিজন লইয়া যারপর নাই সুখে কাল কর্ত্তন করিত। বিক্রমপুরের মত উৎকৃষ্ট ক্ষীর ও মৎস্য বঙ্গের আর কোথাও মিলিত না। এই পরগণার, পূর্ব্বদিকে মেঘনা, ব্রহ্মপুত্র ও পশ্চিম দিকে পদ্মানদী প্রবাহিত থাকায়, ইলিশ, চাইন, রোহিত প্রভৃতি সুস্বাদু নদীজ মৎস্যও তাহারা প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হইত। হায়! একমাত্র কীর্ত্তিনাশা নদীর প্রাদুর্ভাবে সেই রমণীয় স্থান এখন শ্মশানে পরিণত হইয়াছে, অধিকাংশ বিল ঝিল কীর্ত্তিনাশার গর্ভস্থ হইয়া গিয়াছে, হতাবশিষ্ট যাহা কিছু ছিল, তাহাও আবার নদীস্রোত সংমিশ্রিত বালুকারাশিতে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে, কৃষিক্ষেত্র গুলি লোকালয়ে পরিণত ও বালুকারাশিতে নিমজ্জিত হওয়াতে শস্যোৎপন্নের পক্ষে যথেষ্ট অন্তরায় হইয়া পড়িয়াছে। নদীগর্ভে অধিকাংশ স্থান বিলীন হওয়ায়, তত্তৎস্থানীয় লোকেরা অত্যল্প পরিসর স্থানে একত্র সমাবিষ্ট হইয়া বাস করিতেছে। এইরূপ বহুজনতার একত্র সমাবেশে, স্থানগুলি ক্রমে অস্বাস্থ্যকর হইয়া ওলাউঠার মূর্ত্তিমতী রাজধানীতে পরিণত হইয়াছে। আবার এদেশের বর্ষাকালের দশা ভাবিতে গেলে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। তখন বিক্রমপুর ও তৎসন্নিহিত স্থানগুলি দ্বিতীয় সাগরশাখাতে পরিণত হয়, গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে যাতায়াত দূরের কথা, এক গৃহ হইতে ভিন্ন গৃহে যাইতে হইলেও সাঁকো বা নৌকার সাহায্য ব্যতীত যাওয়া আইসার সাধ্য নাই। বোধ হয়, বিধাতা বিক্রমপুরের ভবিষ্যৎ ভাগ্যের বিষয় গণনা করিয়াই দুইটী প্রয়োজনীয় বিষয়ের সৃষ্টি পূর্ব্ব হইতে করিয়া রাখিয়াছিলেন, উহার একটী "ধূড়ী" নামে এক প্রকার কাষ্ঠ যান, অপরটী "গামলা" নামে মৃত্তিকা যান। দক্ষিণ বিক্রমপুর ও ইদিলপুরবাসিগণ প্রথমটী এবং উত্তর বিক্রমপুরবাসী অবস্থা-

পন্ন লোকে দ্বিতীয়টী ব্যবহার করিয়া গৃহ হইতে গৃহান্তরে ও প্রয়োজনীয় স্থানে চলিয়া বেড়ায়। এই সময় বহু হতভাগা লোক "মাচা" বান্ধিয়া গৃহভিত্তির কার্য্য সম্পাদন করে, গৃহের মৃত্তিকা নির্ম্মিত ভিটী সকল এই সময় স্রোতবেগে ধসিয়া পড়িয়া যায়। গৃহ মধ্যে নানাবিধ সরীসৃপ আশ্রয় লইয়া, আবার আশ্রয় স্থানের মালিকের অনিষ্ট সম্পাদন করিতে ত্রুটি করে না। কত মনুষ্য সর্পদষ্ট হইয়া এই সময় মানবলীলা সম্বরণ করে। দরিদ্রেরা গৃহবহির্গমনে অসমর্থ হইয়া এই সময় অনশন ব্রত অবলম্বন করিতে বাধ্য হয়। হায়! সুখপূর্ণ দেশের এই অশুভ পরিবর্ত্তনের কথা কয়জন লোকে ভাবিয়া থাকে? এই পরগণাতে, বহুসংখ্যক কৃতবিদ্য, ধনী, গুণী মনুষ্যের বাসস্থান আছে বটে, কিন্তু তাঁহাদের সহিত দেশের বড়ই অল্প সম্বন্ধ। কার্য্যানুরোধে তাহারা অধিকাংশ সময় বিদেশে অতিবাহিত করেন, দেশের দুর্দ্দশা তাঁহারা বড় স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেন না, কাজেই তাঁহারা তৎপ্রতিকারেও কখন কোন আয়াস স্বীকার করা দূরে থাকুক, একবার ভাবিবারও সময় পান না। এ কথাটি যে কেবল আমরা বিক্রমপুর সম্বন্ধে বলিতেছি, তাহা নয়, ফরিদপুরের অধিকাংশ স্থান সম্বন্ধেই এই উক্তি প্রযুক্ত হইতেছে। দামোদরের বন্যায় মেদিনাপুর ও বৰ্দ্ধমানের একবার মাত্র দুর্দ্দশা করায় তাহার জন্য নানাবিধ পত্রিকায় কত লেখা পড়া চলিয়াছিল, কিন্তু আমাদের ফরিদপুরে এরূপ বন্যা প্রায় প্রতি বৎসর ঘটিয়া থাকে। তবে পূর্ব্ব হইতে সতর্ক থাকায় মনুষ্য বা পশ্বাদির জীবনটা মাত্র রক্ষা পায়। দামোদরের বন্যার প্রসঙ্গ কাউনসেলে পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল, আমাদের দুর্দ্দশার বিষয় স্থানীয় ম্যাজিষ্টেট বা কমিশনরের কর্ণগোচর হয় কিনা সন্দেহ। অধুনা ফরিদপুর সম্মিলনী সভা দেশের অভাব বিমোচনে অগ্রসর হইয়াছে, আমাদের বিবেচনায় তাঁহাদের সর্ব্বাগ্রে এই জলপ্লাবনের প্রতিকার জন্য যত্ন করা কর্ত্তব্য। অবশ্য দেশ হইতে নদী তাড়াইবার সাধ্য বৃটিশ গবর্ণমেন্টেরও নাই, কিন্তু যাহাতে অন্ততঃ স্থানীয় লোকে অনায়াসে সর্ব্বদা গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে চলা ফিরা করিতে পারে, এইরূপ বিধান অবশ্য হইতে পারে। বর্ষার সময়ে মাদারীপুর মহকুমার অন্তর্গত তাবত স্থানে এইরূপ শোচনীয় ভাব ধারণ করে।

লালারাম গতি রায় কৃত "মায়া তিমির চন্দ্রিকা" গ্রন্থ দেড় শত বৎসরের পূর্ব্বে বিরচিত হয় নাই, তন্মধ্যে বিক্রমপুরের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতেও কীর্ত্তিনাশার উল্লেখ নাই। আমরা উক্ত গ্রন্থ হইতে সেই অংশটুকু উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

মহাতীর্থ ব্রহ্মপুত্র পূর্ব্বেতে প্রচার।
পশ্চিমেতে পদ্মাবতী বিদিত সংসার॥
মধ্যেতে বিক্রমপুর রাজ্য মনোহর।
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত তাহে সদজ্ঞানী বিস্তর॥"

আমরা উপরে যে কবিতাটি উল্লেখ করিলাম, তৎপাঠে এই মাত্র জানা যায় যে, বিক্রমপুরের পশ্চিমে পদ্মা ও পূর্ব্বে ব্রহ্মপুত্র নদ প্রবাহিত হইত। রাক্ষসী কীর্ত্তিনাশা তখন বিকট বদন ব্যাদান করিয়া বিক্রমপুরের দিকে অগ্রসর হয় নাই। এখন প্রশ্ন হইতে পারে, বিক্রমপুরের পূর্ব্বদিকে যে বৃহৎ স্রোতস্বতী প্রবাহিত হইয়া মেঘনা নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে, কবি লালারামগতি তাহাকে ব্রহ্মপুত্র বলিয়া পরিচিত করিলেন কেন? এই কথার উত্তর আমরা যতদূর জানিতে পারিয়াছি, তাহা নিম্নে প্রকাশ করা যাইতেছে।

সিদ্ধ শ্রোত্রীয়কুলোদ্ভব গোসাঞি ভট্টাচার্য্য নামে এক মহাত্মা বিক্রমপুরে বাস করিতেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় কেদার রায়ের গুরু ছিলেন। তৎসময় বীরাচারী তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের যথেষ্ট প্রাধান্য ছিল। সর্ব্ববিদ্যা, সিদ্ধিবিদ্যা, অর্দ্ধকালীর সন্তানেরা তখন তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের গুরুস্থানীয়। তৎকালে পূর্ব্ব-বঙ্গের অধিকাংশ লোক শক্তির উপাসনায় নিরত,—স্থানীয় রাজারাও শক্তি-মন্ত্র দীক্ষিত। প্রতাপাদিত্য শাক্ত ছিলেন "যুদ্ধকালে সেনাপতি কালী" এই উক্তি যে তদ্বিষয়ের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে, তাহাতে আর কোন সন্দেহ করিবার কারণ নাই। চন্দ্রদ্বীপের, ভুলুয়ার, বিক্রমপুরের অধিপতিরা সকলেই শক্তি-সেবক ছিলেন। শক্তির কৃপাপাত্র হইয়া তাঁহারা যথার্থ শক্তি-সঞ্চয় করিয়া মায়ের সেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। শুধু প্রেমের বন্যায় যে কখনও মায়ের উদ্ধার সাধন হইবে, এরূপ আশা দুরাশা মাত্র। প্রকৃত শাক্ত হইয়া শক্তিসঞ্চয় করিলেই বরং তাহার আশা করা যায়। যাহা হউক, তৎসময় শাক্ত-গণের মধ্যে অনেক অসাধারণ ক্ষমতাশালী লোক জন্ম গ্রহণ করিয়া, জন-গণকে যথার্থই বিমোহিত করিয়াছিলেন; তন্মধ্যে গোসাঞি ভট্টাচার্য্য মহা-শয়ের একটি ঘটনা এই স্থানে উল্লেখ করা যাইতেছে। বিশেষতঃ এই প্রসঙ্গ পাঠ করিলে মেঘনার একাংশ কেন ব্রহ্মপুত্র বলিয়া পরিচিত হইয়াছে, তাহাও বিশেষরূপে জানা যাইতে পারিবে।

একদা কেদার রায়, গুরু ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে জানাইলেন, "দেব, অশো-কাষ্টমী প্রায় সমাগত, ইচ্ছা আপনার সহিত একত্র হইয়া তীর্থরাজ ব্রহ্মপুত্র-

নীরে অবগাহনান্তে পাপময় দেহ পবিত্র করি।" তখন ভট্টাচার্য্য সহাস্যে প্রত্যুত্তর করিলেন, বৎস, তোমার বা আমার লাঙ্গলবন্ধ * যাইবার কোন প্রয়োজন নাই। লৌহিত্যদেব তোমার রাজধানীর পূর্ব্বপ্রান্ত দিয়া প্রবাহিত হইতেছেন, উহাতে স্নান করিলেই তোমার ব্রহ্মপুত্রে স্নান করা হইবে; তখন রাজা বলিলেন, দেব, আমার রাজ্যের পূর্ব্বপ্রান্ত দিয়া ত মেঘনা নদী প্রবাহিত হইতেছে, উহাকে আপনি কিরূপে লৌহিত্য বলিতেছেন। তৎশ্রবণে ভট্টাচার্য্য, নিজ সম্মুখস্থ একটি কমলালেবু উত্তোলন করিয়া রাজাকে দিয়া বলিলেন, তুমি এই লেবুটি ব্রহ্মপুত্রের জলে যাইয়া নিক্ষেপ কর, যে স্থান হইতে স্বয়ং লৌহিত্য দেব হস্ত প্রসারণ করিয়া উহা গ্রহণ করিবেন, জানিও এতদূর পর্য্যন্ত ব্রহ্মপুত্র নদ প্রবাহিত হইতেছে। যাও বৎস, আমার কথানুযায়ী কার্য্য করিয়া উহার যাথার্থ্য প্রত্যক্ষ কর। রাজা গুরুর আদেশে তৎক্ষণাৎ কতিপয় লোকসহ তরণী আরোহণ করিয়া ব্রহ্মপুত্র উদ্দেশে প্রস্থান করিলেন। তৎপর লাঙ্গলবন্ধের কতক উত্তরবর্ত্তী পঞ্চমীঘাট নামক স্থানে যাইয়া, কমলালেবুটি ব্রহ্মপুত্র জলে নিক্ষেপ করিলেন। যেমন লেবুটি স্রোতবেগে ভাসিয়া চলিল, তৎ পশ্চাৎ পশ্চাৎ রাজার নৌকাও চলিতে লাগিল, কিন্তু লাঙ্গলবন্ধ অতিক্রম করিয়া যখন লেবুটি লক্ষ্যা নদী অভিমুখে চলিল, তখন রাজার মনে একটুকু অবিশ্বাসের উদ্রেক হইল, ক্রমে যেমন কমলালেবু ভাসিয়া চলিল, রাজাও তৎপশ্চাৎ স্বীয় যান চালাইতে লাগিলেন। ক্রমে ঐ লেবুটী আসিয়া কার্ত্তিকপুরের পূর্ব্বদিকে প্রবাহিত মেঘনার একটি ঘোলার মধ্যে পড়িয়া আবর্ত্তিত হইতে লাগিল, রাজাও তথায় নঙ্গর করিয়া নৌকা রাখিয়া দিলেন। এই কথা পূর্ব্বেই দেশময় রাষ্ট্র হইয়া পড়িয়াছিল, রাজার তরণী নদী মধ্যে অবস্থান করায়, চতুর্দ্দিক হইতে নৌকাযোগে লোক আসিয়া তথায় জড় হইতে লাগিল। পরে যখন মধুশুক্লাষ্টমী তিথির আবির্ভাব হইয়া ব্রহ্মপুত্র স্নানের প্রকৃত সময় আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন সহস্র মানব দেখিতে পাইল, নদীগর্ভ হইতে দিব্যালঙ্কারভূষিত এক দেবমূর্ত্তির আবির্ভাব হইল। এদিকে গোসাঞি ভট্টাচার্য্য ঐ কমলালেবুটী নদীগর্ভ হইতে উঠাইয়া ঐ মূর্ত্তির হস্তে প্রদান

---

* ঢাকা জেলার অন্তর্গত নারায়ণগঞ্জের পূর্ব্বদিকস্থ ব্রহ্মপুত্রের অংশ বিশেষ। বলরাম হল (লাঙ্গল) দ্বারা এই স্থান কর্ষণ করিয়া ব্রহ্মপুত্রে জল নিষ্কাসিত করিয়াছিলেন বলিয়া উহার নাম লাঙ্গলবন্ধ হয়। প্রতি বৎসর অশোকাষ্টমীর দিবস এখানে বিস্তর লোকে গমন করিয়া স্নানদানাদি করিয়া থাকে।

করিলেন। দেখিতে দেখিতে দিব্যপুরুষ জলে বিলীন হইয়া গেলেন। দর্শকগণের আর আশ্চর্য্যের ইয়ত্তা রহিল না, তাঁহারা মুক্তকণ্ঠে গোসাঞির গুণগান করিতে করিতে ঐ জলে অবগাহন করিয়া ব্রহ্মপুত্রস্নানের ফললাভ করিলেন। রাজা গুরুপদানত হইয়া, তৎবাক্যের পরীক্ষা করার ত্রুটি জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। পরে গুরুর উপদেশানুযায়ী স্নানদানাদি করিয়া রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিলেন। তদবধি এই তীর্থস্থান কমলাপুর নামে বিখ্যাত হইল, অশোকাষ্টমীর দিবস প্রতিবর্ষে বহুসংখ্যক যাত্রী অদ্যাপি তথায় স্নান করিয়া থাকে। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই ছিল যে, প্রতিবর্ষে ঠিক ঐ অষ্টমী দিবসে বহুসংখ্যক বক কোথা হইতে আসিয়া এই জলে স্নান করিয়া যাইত। এইজন্য এই স্থানের অপর নাম বগিধলি। প্রকৃত প্রস্তাবে মেঘনার এই অংশ প্রকৃত কমলাপুর উদরস্থ করিয়া, অনেক পশ্চিমে সরিয়া পড়িয়াছে।

কবি রামগতি একজন সাধক যোগী পুরুষ ছিলেন। মহাজনগণের এই সকল ঘটনার প্রতি তাঁহার অণুমাত্র অবিশ্বাস ছিল না, এই কারণে তিনি গোসাঞি ভট্টাচার্য্যের কথার উপর নির্ভর করিয়া মেঘনার এই অংশকে ব্রহ্মপুত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

গোসাঞি ভট্টাচার্য্য সম্বন্ধে আরও অনেক আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য ঘটনা শ্রুত হওয়া যায়। তন্মধ্যে যে গুলি কেদার রায়ের সহিত সম্বন্ধজড়িত আছে, তাহা পশ্চাৎ উল্লেখ করা হইবে, এমন কি, এই গোসাঞি ভট্টাচার্য্যের ক্রিয়াকলাপে অনাস্থা প্রকাশই কেদার রায়ের পতনের মূল কারণ হইয়া দাঁড়ায়।

বিক্রমপুর।

চাঁদ রায় ও কেদার রায়।

ষোড়শ শতাব্দীর অন্তভাগে বঙ্গদেশে কতকগুলি ভূম্যধিকারী এক মতাবলম্বী হইয়া দিল্লীশ্বরের অধীনতা হইতে, আপনাদিগকে বিমুক্ত করিবার জন্ত বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। সাধারণতঃ তাঁহারা বারভূঞা নামে প্রসিদ্ধ। আজিও বারভূঞার নাম বঙ্গদেশ হইতে অন্তর্হিত হয় নাই, তাঁহাদের কীর্ত্তির ও কার্য্যকলাপের কোন কোন ভগ্নাংশ বর্ত্তমান থাকায়, অত্যাপি সেই মহানুভবগণের প্রচ্ছানলুপ্ত স্মৃতি জনগণের মনে ক্ষণস্থায়ী তড়িৎসদৃশ সময় সময় একটা আভাস প্রদান করিয়া থাকে।

বারভূঞার নাম লইয়া বড়ই গোলযোগ, কিন্তু তন্মধ্যে জন কয়েক নির্ব্বিবাদে নথিসহ বজায় রাখিয়া আসিতেছেন। তন্মধ্যে ১ম যশোহরের রাজা প্রতাপাদিত্য, ২য় চন্দ্রদ্বীপের কন্দর্প রায়, ৩য় বিক্রমপুরের কেদার রায়, ৪র্থ ভুলুয়ার লক্ষণ মাণিক্য, ৫ম ভূষণার মুকুন্দ রায়, ৬ষ্ঠ ভাওয়ালের ফজলগাজী, ৭ম খিজিরের ঈশাখাঁ মসনদী আলি, ৮ম চাঁদপ্রতাপের চাঁদগাজী, এই আটজন সর্ব্ববাদী-সম্মত ভূঞা।

মিঃ বিভারিজ তৎকৃত বাখরগঞ্জের ইতিহাসের একস্থলে লিখিয়াছেন, পাদ্রী ফুইট ১৫৯৫ খ্রীষ্টাব্দে যখন বঙ্গদেশে আগমন করেন, তৎসময়ে তিনি তৎস্থানীয় দ্বাদশজন ভূম্যধিকারীর আধিপত্য সন্দর্শন ও সেই দ্বাদশজনের মধ্যে ৯ নয় জনকেই মুসলমান বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। আমরা এই কথার কোন ভাব পরিগ্রহ করিতে পারিলাম না। অনেকে মুকুন্দ রায়কে ভূঞা না বলিয়া জমিদার শ্রেণীতে রাখিয়া, মাত্র কেদার রায়, প্রতাপাদিত্য, কন্দর্প রায় এই তিন জনকেই ভূঞা বলিয়া অবশিষ্ট নয়জনকে মুসলমান বলিতে চাহেন, কিন্তু তাঁহাদের নাম গোত্রাদি উল্লেখ করিতে পারেন না। আমাদের মতে তখন যাহারা মোগল বিরুদ্ধে অসি ধারণ করিয়াছিলেন, সেই কালে তাঁহারাই ভূঞা পদবাচ্য ছিলেন।

আমাদের প্রবন্ধোক্ত কেদার রায়ের নাম বারভূঞার তালিকায় স্পষ্ট উল্লেখ

দেখা যায়। চাঁদ রায়কে কেহ কেহ কেদার রায়ের ভ্রাতা বলিয়া থাকেন, কোন কোন মতে তাঁহারা পিতা পুত্র ছিলেন। এই রায়গণ ঘৃতকৌশিকী গোত্রীয় কায়স্থ বংশজ বলিয়া পরিচিত, আবার কেহ কেহ বা কটকী কায়েথ বলিয়াও নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। মূল বংশ বিশুদ্ধ না হওয়া প্রযুক্ত ঘটকেরা তাঁহাদের বংশাবলী কুলজ্ঞাগ্রন্থে উল্লেখ করেন নাই। বিদ্বানই হউন, সাধু বা রাজাই হউন, যদি কুলের মূলে কিছু সার না থাকিত, তবে আমাদের বঙ্গায় কুলজ্ঞালেখকেরা তাহাদের গ্রন্থে কখনও সেই সকল মহাত্মা লোকদিগকে স্থান প্রদান করিতেন না। অথচ কুলীনের অসাধু, মূর্খ সন্তানগুলির নামের তালিকা দ্বারা গ্রন্থ পূর্ণ করিতে কতই যত্ন ও প্রয়াস পাইয়াছেন। এই কারণে কি ব্রাহ্মণ, কি বৈদ্য, কি কায়স্থ, এইরূপ ভদ্র বংশসম্ভূত কত কত মহাত্মার বংশাবলীর উল্লেখাভাব প্রযুক্ত আমাদের জাতীয় ইতিহাস লিখার পক্ষে মহা অন্তরায় হইয়া পড়িয়াছে। একমাত্র কিম্বদন্তী ও পারসী ইতিহাসে দুই চারিপংক্তিতে যদি কিছু প্রাপ্ত হওয়া যায়, তবেই আমাদের একমাত্র ইতিহাস লিখার সুযোগ হয়। আমরা এই সুবিধাটী কম মনে করি না, যদি তাহাও না পাইতাম, তবে হয়ত কত মহাত্মার অনন্ত নিদ্রার সহিত, তাঁহার কার্য্যাবলী বা গুণগ্রামের পরিচয়ও কালের অনন্ত তামসীতে চিরবিলীন হইয়া যাইত। আমরা শত চেষ্টা করিয়াও তাহার পুনরুদ্ধার করিতে সক্ষম হইতাম না।

পূর্ব্ব ও উত্তর বঙ্গ বারভূঞাগণের প্রধানতম লীলাক্ষেত্র। ভাগীরথীর পূর্ব্ব তট হইতে আরম্ভ করিয়া, বরাবর সমুদ্র তীর দিয়া বর্ত্তমান যশোহর, খুলনা, বাখরগঞ্জ, নোয়াখালী প্রভৃতি জেলার অধিকাংশ এবং তৎপর উত্তর দিকে ফরিদপুর ও ঢাকার কতকাংশ এবং তদুত্তর পশ্চিম দিকে রাজসাহী ও পাবনা ও দিনাজপুর জেলার কতক স্থান লইয়া বারভূঞাদের একটী দেশ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তৎসময়, বঙ্গীয় ভূম্যধিকারীরা যেরূপ দলবল সঞ্চয় করিয়াছিলেন, তাহাতে বোধ হয় উঁহাদের স্বাধীন হইবার আশাটী তত অসম্ভব কার্য্য মধ্যে পরিগণিত হইবার কথা ছিল না। তবে বিধাতা চিরকাল যাহাদের প্রতি বিমুখ, যে দেশ চিরদিন স্বজনদ্রোহী দ্বারা পরিবৃত, ভ্রাতৃহিংসা পর্য্যন্তও যে দেশ হইতে বিদূরিত হয় নাই, সে দেশের কল্যাণ আর কিরূপে হইতে পারে? বারভূম্যধিকারীরা বহু চেষ্টা করিয়া স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষা জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু কতিপয় স্বদেশদ্রোহী স্বজনের হিংসা ও

পরশ্রীকাতরতায় তাহাদের সে আশা শূন্যে বিলীন হইয়া গেল। তাঁহারা শেষ পর্য্যন্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও যখন আর কুল কিনারা পাইলেন না, তখন আত্মাহুতি প্রদান করিয়া, জন্মভূমির নিকট চির-বিদায় গ্রহণ করিলেন। স্বদেশদ্রোহী তাঁহাদিগকে ধিক্কার দিতে লাগিল, মাতার সুসন্তানের জন্য সহৃদয় দুই চারি জন দুই চারি বিন্দু অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া, রাজপুরুষগণের অলক্ষিতে তাহা আবার মুছিয়া, রাজার জয়জয়কার দিতে বসিল।

এই ভূম্যধিকারী দলের অভ্যুত্থানের সমকালে বঙ্গদেশের অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহার কিছু বিবরণ প্রকাশ করা কর্ত্তব্য বোধে আমরা এস্থলে তৎসময়ের কতিপয় বিবরণ প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। মোগল বাদসাহগণের রাজত্ব পর্য্যন্ত, বাদসাহের প্রতিনিধিস্বরূপ মুসলমান নবাব দ্বারা বঙ্গদেশ শাসিত হইত বটে, কিন্তু তৎকাল পর্য্যন্ত সাধারণ প্রজা ও দেশ রক্ষণাবেক্ষণের ভার দেশীয় জমিদারগণের উপরেই অধিক পরিমাণে নির্ভর করিত। এই জন্য প্রত্যেক জমিদারের অধীনেই পদাতি, অশ্বারোহী সৈন্য ও জলপথে গমনোপযোগী যান সকল সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিত। আইন-ই আকবরী গ্রন্থ পাঠ করিয়া জানা যায়, বাদসাহ আকবর সাহের রাজত্ব সময়ে বঙ্গদেশীয় জমিদারেরা ২৩৩৩০ জন অশ্বারোহী, ৮০১১৫০ জন পদাতি, ১৭০টী হস্তী, ৪২৬০টী কামান এবং ৪৪০০ নৌকা সম্রাটের জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত রাখিতেন। সম্রাট যখন আদেশ করিতেন তখনই জমিদারেরা এই সকল সৈন্য ও হস্তী অশ্বাদি লইয়া তাঁহার কার্য্যে নিয়োগ করিতেন। আমাদের নিকট এই কথাগুলি অতিরঞ্জিত বলিয়া বোধ হইলেও, জমিদারেরা যে তৎকালে আধুনিক করদ ও মিত্র রাজগণের মত বলসম্পন্ন ছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান করদ ও মিত্র রাজগণ, রেসিডেণ্টরূপ রজ্জুতে আবদ্ধ হইয়া, যেমন ত্রাহি ত্রাহি চীৎকারে, সময় সময় সুধাধবলিত হর্ম্ম্যরাজি বিদীর্ণ করিয়া ফেলেন, তখনকার এই জমিদারগণ এতদপেক্ষা সুখ স্বচ্ছন্দে থাকিতেন বলিয়া বোধ হয়। একমাত্র নির্দ্দিষ্ট রাজকর প্রদান করিলেই তাঁহারা স্বাধীন নৃপতির ন্যায় আপনাপন অধিকারে কার্য্য পরিচালনা করিতে সমর্থ হইতেন।

মহাত্মা আকবরের রাজত্বসময়ে এই সকল ভূম্যধিকারীর মধ্যে কতক, তাঁহার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া চলিত। কিন্তু বাদসাহের কর্ম্মচারীর সহিত তাহাদের ততটা সম্মিলন ঘটিল না, কেন এই মনোমালিন্য ঘটিল, কাহার জন্য দ্বাদশ ভূম্যধিকারী বাদসাহের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইল তাহার বিবরণ অনু-

সন্ধান করিতে গেলে বোধ হয় যে তৎকাল পর্য্যন্ত যদিও বাদসাহ বাঙ্গালার অধিপতি ছিলেন, তথাপি পাঠানেরা সময় সময় তাঁহাদের আধিপত্য স্বীকার করিতে চাহিত না। বিশেষতঃ যদি তাহারা কোনরূপ বুঝিত, সম্রাট, তাহাদের স্বশ্রেণীর কোন ব্যক্তির প্রতি অন্যায়রূপে অত্যাচার করিয়াছেন বা কবিতেছেন তখন পাঠানেরা আত্মহারা হইত, আপনাদের পূর্ব্ব বলও অধিকার মনে ভাবিয়া তাহাদের শিরায় শিরায় শোণিত উদ্বেলিত হইয়া উঠিত। তখন ভালমন্দ বিবেচনা তাহাদের অন্তঃকরণে আর স্থান পাইত না। কেবল প্রতিহিংসা ও পুর্ব্বাধিকারের পুনরভ্যুদয় তাহাদিগের স্মৃতিতে জাগরিত হইয়া তাঁহাদিগকে মোগল বাদসাহগণের প্রতিকূলে উত্তেজিত করিয়া তুলিত, ভবিষ্যৎ ভাবিবার আর সময় থাকিত না। টোডরমল্লের অন্যায় বন্দোবস্ত ভূম্যধিকারীদের বিদ্রোহের অন্যতম কারণ।

মানসিংহের আগমনের পূর্ব্বে রালফফিস নামে একজন ইয়োরোপীয় ভ্রমণকারী, বঙ্গদেশে আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহার লিখিত বির্বরণী হইতে জানা যায়, তৎসময় বঙ্গদেশে দ্বাদশজন ভৌমিক ছিল। তন্মধ্যে বাকলা (চন্দ্রদ্বীপ) ও শ্রীপুর (বিক্রমপুর) দক্ষিণ ও পূর্ব্ববিভাগের দুইটী রাজধানী ছিল। ১৫০৬ খ্রীঃ অঃ পর্য্যন্ত বৃহৎ হিন্দুনগরী বাকলা নামে অভিহিত হইত। সন্দীপ পর্য্যন্ত বিক্রমপুরের কেদার রায়ের রাজ্য বিস্তারের বিবরণ পাওয়া যায়। কিন্তু উহা পর্টুগীশদের সাহায্য ব্যতীত হস্তগত রাখিবার উপায় ছিল না। আরাকানের মঘেরা ঐ স্থান কি সমুদ্র তীরস্থ অন্যান্য স্থানে আপতিত হইয়া তত্রত্য অধিবাসীদিগকে বড়ই ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল, হিন্দুরাজগণ জলযুদ্ধে অক্ষম ছিলেন কিন্তু মঘেদের মধ্যে অনেক পরিশ্রমী ও বহুদর্শী নাবিক ছিল। ডাক্তার জেকির লিখিয়াছেন* কেদার রায়কে পর্টুগীশ সৈন্যের সাহায্য লইয়া সন্দীপ রক্ষা করিতে হইত।

সন্দীপ দক্ষিণ সাহাবাজপুরের পূর্ব্বদিকে মেঘনা নদীর সহিত সাগরসঙ্গমের মধ্যস্থলে সংস্থাপিত, ততদুর পর্য্যন্ত কেদার রায়ের অধিকার প্রসারিত থাকিলে মধ্যবর্ত্তী ইদিলপুর, কার্ত্তিকপুর, উত্তর ও দক্ষিণ সাহাবাজপুর, প্রভৃতি স্থানগুলি নিশ্চয় কেদার রায়ের অধিকারভুক্ত ছিল। এই হিসাবে পশ্চিমে পদ্মা, পূর্ব্ব উত্তরে ধলেশ্বরী, দক্ষিণদিকে আরিয়লখাঁ নদী . ও পূর্ব্বে মেঘনায় সম্মিলিত

* মেঃ বিভারেজ কৃত বাখরগঞ্জ ইতিহাসের সাধারণ বিবরণ দেখ।

সাগরাংশ এই চতুঃসীমা মধ্যবর্ত্তী স্থানগুলি, নিশ্চয় কেদার রায়ের হস্তগত থাকা বিবেচিত হয়।

মিঃ ফারনেন্ডে আরাকান, শ্রীপুর (বিক্রমপুর) চণ্ডীখান্ (যশোহর) এই তিনটী রাজ্যকে বাঙ্গালার অন্তর্গত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সাহেব লিখিয়াছেন "মোগলদের পরাক্রম সত্ত্বেও ঐ প্রদেশাধিপতিরা যথেষ্ট প্রভুত্ব ভোগ করিত। বিশেষত চণ্ডীখান ও শ্রীপুরাধিপতিরা মোগল পরাক্রম সত্ত্বেও স্ব স্ব রাজ্যে সর্ব্বময় কর্ত্তা ছিলেন।* প্রবল পরাক্রান্ত মোগলাধিপত্য সময়ে যাঁহারা এইরূপে স্বাধিকৃত প্রদেশে সর্ব্বতোভাবে ক্ষমতা পরিচালন করিতে পারিতেন, তাঁহারা যে কম ক্ষমতাশালী ছিলেন, তাহা কোনরূপে বিশ্বাস করিতে পারা যায় না।

চাঁদ ও কেদার রায়ের সময়ে বিক্রমপুরের রাজধানী 'শ্রীপুর' নামক স্থানে সংস্থাপিত ছিল। এতদ্ভিন্ন তাঁহাদের প্রচুর কীর্ত্তির নিদর্শন স্বরূপ অত্যুচ্চ ও মনোহর হর্ম্ম্যমালা, দেবালয় ও বৃহৎ জলাশয় প্রভৃতি বক্ষে ধারণ করিয়া, তৎকালে বঙ্গদেশ মধ্যে শ্রীপুর যথার্থ শ্রীস্থানীয় ও লোকলোচনানন্দদায়ী হইয়া উঠিয়াছিল। পরে যদিও পদ্মার অন্যতর শাখা কীর্ত্তিনাশা নদীর উদ্ভবে ও তাহার প্রচণ্ড তরঙ্গাঘাতে ঐ সকল কীর্ত্তিরাজি বিলয়প্রাপ্ত হইয়া বিস্মৃতির চিরতামসে বিলীন হইয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু তথাপি একমাত্র কীর্ত্তিনাশার সহিত উহার যে অর্থ সংযুক্ত রহিয়াছে, তাহাতেই রায় রাজগণের কীর্ত্তির কতকটা আভাস ক্ষণস্থায়ী তড়িতবৎ অদ্যাপি মানবগণের মর্ম্ম স্পর্শ করিতে সমর্থ হয়।

বারভূঞা দল ক্রমে এইরূপ দুর্দ্ধর্ষ হইয়া পড়িল যে, বাদসাহের প্রতিনিধিরা তাহাদিগকে আর কোন মতেও বাধ্য রাখিতে পারিল না। দূরদূরান্তর হইতে বিদেশীয়েরা বিবেচনা করিতে লাগিল, এইবার বুঝি বঙ্গদেশ মুসলমানের হস্ত হইতে উদ্ধার পাইয়া আবার হিন্দু সাম্রাজ্যে পরিণত হয়। বঙ্গসন্তানেরা, কিছুকাল পরস্পরের প্রতি, সহানুভূতি ও বিশ্বাস রাখিয়া, কার্য্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু বিধাতার কি বিধান যে, পরে কিন্তু তাঁহারা আর আত্মসংবরণ করিতে পারিলেন না সেই কূটনীতির অনুসরণ করিয়া তাঁহারা পরস্পরের প্রতি হিংসানল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। পরিণামে সকলেই উহাতে পতঙ্গবৎ বিদগ্ধ হইয়া স্ব স্ব কর্ম্ম ফলানুযায়ী উপযুক্ত শাস্তি প্রাপ্ত হইলেন।

* Early Travels in India by Farnandez pp. 3 & 11.

'আত্মদ্রোহিতা মহাপাপ' এই কথা ভারতবাসীরা যে কখনও বুঝিয়াছিল, অথবা বুঝিবে, তাহা বিশ্বাসাতীত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সত্যযুগই বল, আর কলিকালই বল, ভারতের যত কিছু বীরানুষ্ঠান সীমাবদ্ধস্থানে স্বজাতীয়ের প্রতিই খাটাইতে প্রয়াস পাইয়াছে। ভারতীয় রাজগণের অশ্বমেধ ঘোটক, হিমালয়, মণিপুর, গান্ধার অতিক্রম করিয়া, কখনই ভিন্নদেশে শুভগমন করে নাই। বিশেষতঃ পরকে প্রশ্রয় দিয়া প্রতিবাসীর গৃহভিত্তি উচ্ছিন্ন করিতে এই ভারতীয় জনগণ যতদূর মজবুত, বোধ হয় পৃথিবীর সর্ব্বত্র বিচরণ করিলেও, এমন দ্বিতীয় জাতি মিলে কিনা সন্দেহ। বঙ্গদেশ, এই ভারতের একাংশ মাত্র সমভাবাপন্ন অপেক্ষা স্বজন-নিপীড়ন-স্পৃহা ইহাদের বরং এক ডিগ্রী উপরে। বঙ্গের মৃত্তিকার এমনই আশ্চর্য্য গুণ যে তদ্দ্বারা শিব গড়িতে গেলেও বানর হইয়া দাঁড়ায়। উহা বঙ্গের নৈসর্গিক-নিয়ম কি তদ্দেশীয় জনগণের ললাটের অখণ্ডনীয় দোষ তাহা আজিও নির্ণীত হয় নাই। আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত উহারা দশে মিলিয়া কোন কার্য্য এ পর্য্যন্ত করিতে পারিয়াছে কি না তাঁহা সাধারণ জনগণের অবিদিত নাই। বঙ্গীয় দ্বাদশ ভূম্যধিকারীরা স্বদেশ-উদ্ধার-কল্পে ব্রতী হইয়াছিলেন বটে কিন্তু পরে আর সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে পারেন নাই। কতিপয় স্বদেশদ্রোহীর প্ররোচনায় ও কূট মন্ত্রণাজালে পতিত হইয়া তাঁহারা আত্মহারা হইয়াছিলেন। এবং পরস্পর একে অন্যের প্রতি অত্যাচার ও প্রভুত্ব স্থাপনের ক্রটি করেন নাই। উহার পরিণাম ফল এই দাঁড়াইল যে কেহই আর সঙ্কল্প সিদ্ধি করিয়া মস্তকোন্নত রাখিতে পারিলেন না। কাহারও মুণ্ড ধরায় নিপতিত হইয়া মুসলমান রাজার চরণচুম্বনে কৃতার্থম্মন্য হইল; যাঁহারা তদ্বিপরীত আচরণ করিলেন তাঁহাদের মস্তক মহম্মদীয়গণের অসি প্রহারে দ্বিখণ্ডিত হইয়া ধরাবলুণ্ঠিত হইতে লাগিল। সেই স্বদেশ-প্রেমিকগণের দেশহিতৈষিতার ও আত্মত্যাগের কথা সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রেই বিস্মৃত হইল না।

গ্রহবৈগুণ্য বা দুরদৃষ্টবশত যখন মানব স্কন্ধে দুর্ব্বুদ্ধির আবির্ভাব হয়, তখন সহস্র চেষ্টা সত্ত্বেও তাহা অপনোদন করা সহজসাধ্য হইয়া উঠে না। দ্বাদশ ভূম্যধিকারীরা মিলিয়া মিশিয়া বাদসাহের হস্ত হইতে স্বদেশ উদ্ধার করিবার জন্য, অনেক দূর অগ্রসর হইলেন বটে, কিন্তু পরিণামে উহা, আকাশ-কুসুমবৎ কোথায় যাইয়া যে সরিয়া পড়িল, তাহা আর লোক-লোচনের আয়ত্তাধীন হইল না।

একটী সামাজিক বিষয় লইয়া, কেদার রায়ের সহিত তদীয় অমাত্য শ্রীমন্ত

খাঁর বড়ই মনান্তর ঘটিয়াছিল। কোটীশ্বরের দেবল ব্রাহ্মণকে গোষ্ঠীপতিত্ব পদ প্রদান করায়, প্রকৃত শ্রোত্রিয় শ্রীমন্ত উহার প্রতিকূলাচরণ করে। কিন্তু রাজাজ্ঞানুসারে পশ্চাৎ তিনি ঐ দেবল ব্রাহ্মণকে গোষ্ঠীপতি শ্রোত্রিয় বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হন। হীনভাবাপন্ন লোকের সমকক্ষ করায়, কেদার রায়ের প্রতি শ্রীমন্ত আন্তরিক ক্রুদ্ধ হন। তদবধি কি প্রকারে রাজশ্রী বিনষ্ট হইবে, এই দুশ্চিন্তা নিয়ত তাঁহার হৃদয়ে পরিপোষিত হইয়া আসিতেছিল। ইতিমধ্যে এমন এক মহা সুযোগ সংঘটিত হইল, যদাশ্রয়ে পাপিষ্ঠ অমাত্য আপনার প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিয়া লইতে, সম্পূর্ণ সক্ষম হইয়াছিল।

কোন সময়ে খিজিরাধিপতি ঈশা খাঁ, মিত্ররাজ কেদার রায়ের ভবনে শুভাগমন করিয়া, তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ করেন। খাঁ সাহেবের আগমনে শ্রীপুর নানারূপ আমোদ উৎসবে মাতিয়া উঠে। কেদার রায় যথাসাধ্য তাঁহাকে যত্ন ও অভ্যর্থনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু বিধাতার কি বিধান যে,এই আমোদ আহ্লাদই পরিণামে তাঁহাদের বন্ধুতাছিন্নের ও চির মনান্তরের কারণে পরিণত হইল।

চাঁদ রায়ের কন্যা স্বর্ণ বা সোণামণি, অসামান্য রূপলাবণ্যবতী ষোড়শী যুবতী রমণী ছিল। ভাগ্যদোষে বাল্যকালে তাহার পতির মৃত্যু হয়। তদবধি সেই লাবণ্যবতী বালবিধবা পিতা ও খুল্লতাতের আশ্রয়ে থাকিয়া, জীবন যাপন করিতেছিল। ঈশা খাঁ যখন বিক্রমপুরাধিপতি কেদার রায়ের ভবনে অবস্থান করেন, তৎকালে খাঁ সাহেব একদা কোন ক্রমে সেই ললনারত্ন সোণামণিকে দেখিতে পান। এই সন্দর্শনই বঙ্গের চিরপরাধীনতা স্খলনের প্রধান অন্তরায় হইয়া, মিত্ররাজদ্বয়ের পক্ষে, ঘোর মনোমালিন্যের কারণ হইয়া পড়ে।

ঈশাখাঁ, স্বদেশে প্রস্থানান্তর সোণামণিকে পাইবার জন্য চাঁদ ও কেদার রায়ের নিকট দূত প্রেরণ করেন। বোধ হয়, তাঁহার মনে এই বিশ্বাস ছিল যে বিধবা রমণীকে পরিত্যাগ করিতে, বিশেষতঃ তাঁহার মত যোগ্য ব্যক্তির হস্তে সমর্পণ করিতে রায়রাজগণ কখনই অসম্মত হইবেন না। কিন্তু হিন্দুর, বিশেষতঃ একজন স্বাধীন পরাক্রান্ত নৃপতির নিকট ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীর স্ত্রী কন্যা ভগিনী চাহিয়া পাঠান যে কতদূর ধৃষ্টতা, ফল প্রাপ্তির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তৎসাময়িক মুসলমানেরা অনেকেই তাহা বুঝিতে পারেন নাই।

দূত প্রমুখাৎ ঈশাখাঁর মনোগত ভাব অবগত হইয়া, কেদার রায় তৎক্ষণাৎ সেই বার্ত্তাবহকে দূরীকৃত এবং পরে যুদ্ধ-ঘোষণা করিয়া প্রথমেই ঈশাখাঁর অধিকৃত কলাগাইছার দুর্গ আক্রমণ করিয়া বিধ্বস্ত করেন। অতঃপর ঈশাখাঁ ত্রিবেণীর দুর্গে আত্মরক্ষার জন্য আশ্রয় গ্রহণ করে। চাঁদ ও কেদার রায় ঐ দুর্গ আক্রমণ করিয়া খিজিরপুর লুণ্ঠন করেন। তখন খাঁসাহেবের চৈতন্যোদয় হইল যে, হিন্দুর নিকট তাহাদের কন্যা ভগ্নী প্রার্থনা করিয়া কি মারাত্মক ব্যাপার সংঘটিত করা হইয়াছে। এখন যাহাতে উভয় দিক রক্ষা পায়, তাহার কোন সুযোগ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন।

এই সময়ে শ্রীমন্ত খাঁ, চাঁদরায়ের সহিত খিজিরপুরে অবস্থান করিত। রায় রাজগণের জয়াপেক্ষা পরাজয়ই তাহার আন্তরিক ইচ্ছা। কিন্তু ঘূণাক্ষরেও সেই মনোগতভাব প্রকাশ করা দূরে থাকুক, বরং সমধিক বন্ধুতার ভাণ করিয়া চলিত। কোন সুযোগে এই অমাত্য ঈশাখাঁর সহিত সাক্ষাৎ করিলে পর, খাঁ সাহেব তাহাকে পরম সমাদরে গ্রহণ করেন। তাহাদের পরস্পর কথাবার্ত্তার পর ঠিক হয়, যে কোন উপায় হউক, শ্রীমন্ত সোণামণিকে আনিয়া ঈশাখাঁর অঙ্কশায়িনী করিয়া দিবে। তৎপরিবর্ত্তে খাঁসাহেব তাহাকে প্রচুর পুরস্কার প্রদান করিবেন। কিছু নগদ পুরস্কার গ্রহণান্তর শ্রীমন্ত ঐ সোণামণিকে করায়ত্ত করিবার জন্য, বিক্রমপুর প্রস্থান করে।

চাঁদ ও কেদার রায়ের অজ্ঞাতসারে, শ্রীপুর আসিয়া শ্রীমন্ত প্রকাশ করিল রাজাদ্বয় শত্রুহস্তে বন্দী হইয়াছেন। ঈশাখাঁ অচিরে সসৈন্যে শ্রীপুর আক্রমণ করিয়া, সোণামণিকে আত্মসাৎ করিবে। এই সংবাদ প্রচারিত হইবা মাত্র, রাজপুরীতে হাহাকার রব পড়িয়া গেল। কি রূপে রাজধানী ও সোণামণিকে রক্ষা করা যাইতে পারে, তাহারই পরামর্শ চলিতে লাগিল। শ্রীমন্ত, রাজপরিজনকে পলায়নের পরামর্শ প্রদান করেন। কিন্তু সর্ব্বপ্রধান মন্ত্রী বৈদ্য বংশীয় রঘুনন্দন চৌধুরী, তাহার কোন কথায়ই স্বীকৃত না হইয়া রাজধানী রক্ষার উপায়াবলম্বন করিতে লাগিলেন। এদিকে রাণী রাজ্য রক্ষার জন্য যতদূর ব্যস্ত না হউন কন্যা সোণামণিকে রক্ষার জন্য তদপেক্ষা অধিকতর উতলা হইয়া উঠিলেন। পরে শ্রীমন্তের প্ররোচনায় এই ঠিক হইল যে সোণামণিকে তাহার শ্বশুরালয় চন্দ্রদ্বীপে রাখিয়া আসিলে একরূপ নিশ্চিন্ত থাকা যাইতে পারে। রঘুনন্দন এই কথারও প্রতিবাদ করিলেন বটে কিন্তু রাণীকে কোন রূপেই স্বমতে আনিতে পারিলেন না। নৌকাযোগে রাজকন্যাকে শ্বশুরালয়ে

পাঠান স্থিরীকৃত হইলে ধূর্ত্ত শ্রীমন্তই তাহার রক্ষক হইয়া চলিল। এদিকে নাবিকদের সহিত পূর্ব্বেই শ্রীমন্ত বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছিল তদনুসারে তাহারা চন্দ্রদ্বীপের পরিবর্ত্তে নৌকা সোণার গাঁ অভিমুখে চালাইয়া দিল। বলা বাহুল্য শ্রীমন্ত সোণামণির সহিত অচিরে সোণার গাঁ পৌঁছিয়া চাঁদরায়ের সেই অসামান্য রূপলাবণ্যবতী তনয়াকে ঈশাখাঁর হস্তে সমর্পণ করিল। উহা এইরূপে সুসম্পন্ন হইল যে চাঁদ বা কেদার রায় এ বিষয়ের কিছুমাত্র পূর্ব্বে অবগত হইতে পারেন নাই। পরে যখন সমুদয় প্রকাশ হইয়া পড়িল, তখন মনঃক্ষোভে চাঁদরায় যুদ্ধভার কেদার রায়ের হস্তে সমর্পণ করিয়া খিজিরপুর হইতে স্বীয় রাজধানীতে প্রস্থান করিলেন।

চাঁদরায় রাজধানীতে পৌঁছিয়া অমাত্য বন্ধুবান্ধব কাহারও সহিত আর বাক্যালাপ করিলেন না কেবল অনশনব্রত অবলম্বন করিয়া কোটীশ্বরের মন্দির মধ্যে পতিত হইয়া রহিলেন। প্রবাদ আছে এই অবস্থায় দুই দিবস অতিবাহিত হইলে পর তদীয় ইষ্টদেবী তাঁহাকে স্বপ্নাবস্থায় দর্শন দিয়া বলিলেন, "বৎস, যাহা হইবার হইয়াছে, এখন অকারণে এই লোকক্ষয়কর যুদ্ধ হইতে ক্ষান্ত থাকাই শ্রেয়স্কর। এখন ভবিষ্যৎ বিপদ হইতে মুক্ত হইবার জন্য বদ্ধপরিকর হও।" এই প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত হইয়া চাঁদরায় মনে ভাবিলেন যে, সোণামণিকে উদ্ধার করিতে পারিলেও আর তাহাকে সমাজে গ্রহণ করা যাইতে পারিবে না। বিশেষতঃ বাদসাহের সহিত যেরূপ বিবাদ বাধিয়া উঠিয়াছে, তাহাতে কখন কি হয়, বলা যায় না। অতএব এই যুদ্ধ হইতে এখন বিরত থাকাই কর্ত্তব্য। তৎপর কেদার রায়কে যুদ্ধে ক্ষান্ত দিয়া রাজধানীতে আসিবার জন্য বিশ্বস্ত দূত প্রেরিত হইল। এই সময় কেদার রায়, খিজিরপুর মথিত ও ঈশাখাঁর দুর্গ গুলি বিধ্বস্ত করিয়া, তাহার আশ্রয়স্থান ত্রিবেণী দুর্গও অবরোধ করিয়াছিলেন। এখন ভ্রাতৃ আদেশ প্রাপ্তান্তে নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত দুর্গাবরোধ পরিত্যাগ করিয়া, স্বদেশে প্রস্থান করিলেন।

এই সকল ঘটনার পর, কন্যারত্ন হারাইয়া ও রাজ্যের পরিণাম চিন্তা করিয়া চাঁদরায় অন্তিম শয্যায় শায়িত হন। সেই বীরজীবন, পরিণত বয়সে নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়া, কোটীশ্বরের পদমূলে আশ্রয় গ্রহণ করে। ইহ জগতের সুখদুঃখের সহিত তাহার আর কোন সম্বন্ধ রহিল না। দুষ্ট ধূর্ত্ত বিশ্বাসঘাতক শ্রীমন্তখাঁ বিক্রমপুর পরিত্যাগ করিবা, খিজিরপুরে আশ্রয় গ্রহ

করিল। কেদার রায় বিক্রমপুরের সিংহাসনে উপবেশন করিলে, আকবর বাদসাহের মৃত্যুর পর, ১৬০৬ খ্রী অব্দে, সেলিম, জাহাঙ্গীর নাম ধারণ করিয়া পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করেন। পরে সেরকে হত্যা করিয়া, তৎপত্নী মেহে-রুন্নসাকে নুরজাহান নাম প্রদান করতঃ আপন সিংহাসনের অর্দ্ধাংশভাগিনী করিয়া লন। এই সময় বঙ্গীয় জমিদারেরা, বাদশাহের প্রতিকূলে নানারূপ ষড়যন্ত্র করিতে লাগিল। সুযোগ পাইয়া পর্তুগীস গেঞ্জালিস্, চাঁদরায়ের হস্ত হইতে সন্দীপের আধিপত্য কাড়িয়া লইল। বারভূঞাদল একযোগে কোন কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত না হইয়া, পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ করিতে লাগি লেন। যশোহরাধিপতি প্রতাপাদিত্যের সহিত তাঁহার জামাতা চন্দ্রদ্বীপাধি-পতি রাজা রামচন্দ্রের মনোমালিন্য ঘটিল। আবার রামচন্দ্রের সহিত ভুলুয়ার লক্ষ্মণ মাণিক্যের বিষম শত্রুতা হইয়া দাঁড়াইল। বিক্রমপুরাধিপতি কেদার রায়ের সহিত খিজিরপুরের ঈশাখাঁর মসনদই আলির অনৈক্য ও যুদ্ধাদির কথা ইতিপূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। এই সকল অনর্থকর গৃহচ্ছিদ্রে লিপ্ত থাকিয়া, বারভূঞা দল যখন স্বীয় স্বীয় পদে কুঠারাঘাত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, সেই সুযোগে বাদশাহ অম্বরাধিপতি রাজা মানসিংহের প্রতি বাঙ্গালার বিদ্রোহী জমিদারদিগকে দমন জন্য আদেশ প্রদান করিলেন। মানসিংহ ১৬০৫ খ্রীঃ অব্দে বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা পদে নিযুক্ত হইয়া, রাজমহলে রাজধানী সংস্থাপন করেন। তৎকালে ভূম্যাধিকারিগণ. বাদসাহের প্রতিকূলে যে কিরূপ উদ্ধত ভাব ধারণ করিয়াছিলেন তাহার একটী চিত্র জনৈক মুসল-মান গ্রন্থকারের লিখিত বিবরণী হইতে উদ্ধৃত করিয়া এস্থলে প্রদর্শন করা যাইতেছে।

"জাফর খুলনাৎ—উৎতওয়ারিখ নামক পারস্য পুস্তক অবলম্বনে, লক্ষ্ণৌ নিবাসী সের আমিজাফর "আরশ ই-মহামিন্দ, নামক যে উর্দ্দু গ্রন্থ ১৮০৫ খ্রীঃ অব্দে অনুবাদ করেন তাহাতে জাহাঙ্গির নগর (ঢাকা) সম্বন্ধে এইরূপ জানা যায় "বাঙ্গালার জমিদারেরা নিতান্ত উদ্ধত ও অভদ্র হইয়া পড়িয়াছে তাহারা পূর্ব্বের ন্যায় সম্রাট সরকারে রাজস্ব দেয় না উহারা তাহার প্রতিফল পাইয়াছে।"

মানসিংহের সময়ে বাঙ্গালার রাজধানী রাজমহল হইতে ঢাকাতে পরিবর্ত্তিত হয়। ঢাকা বাদশাহের নামানুসারে জাহাঙ্গীর নগর নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। বর্দ্ধমান ও ঢাকা এই দুইটীকে প্রধান কেন্দ্র স্থান করিয়া মানসিংহ

বার ভূঞাদল নির্ম্মূল করেন। মুসলমান ইতিহাস-লেখক, জমিদারগণকে অভদ্রই বলুন, বা যাহাই বলুন, কিন্তু তৎকালের প্রদেশীয় শাসনকর্ত্তারাই যে সকল গোলযোগের মূল ছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাঁহাদের অযথা আবদার ও অর্থ-লালসা পূর্ণ করিতে না পারায় অনেক ভূম্যধিকারী লাঞ্ছিত হন। এই কারণে আপনাদের মান ও সম্পত্তি রক্ষার জন্য প্রধান প্রধান কয়েক জন জমিদার একত্র হইয়া বাদশাহের অধীনতা হইতে আপনাদিগকে স্বাধীন ঘোষণা করিতে প্রবৃত্ত হন। জাহাঙ্গীরের সিংহাসনারোহণের সহিত সের সা হত ও তৎপত্নী মেহেরউন্নেসা অপহৃত হওয়ায় তাঁহার নিকট সুবিচারের আশাও কাহারও রহিল না; কাজেই বাদশাহের বিরুদ্ধে অনেক জমিদারই চলিতে লাগিলেন।

বঙ্গদেশে আগমন করিয়া মানসিংহ ভূঞাদলের মধ্যে মতভেদ জন্মাইয়া দিবার জন্য প্রয়াস পাইলেন। ভবানন্দ মজুমদার ও শ্রীমন্ত খাঁ প্রভৃতি তাঁহার সহায়তায় নিযুক্ত হইল। তাহারা মানসিংহকে ঘরের যাবতীয় বিবরণ প্রকাশ করিয়া দিল। সৈন্য কিরূপ ভাবে কোন পথে চালাইলে অনায়াসে যুদ্ধের সুবিধা হইতে পারে, তৎসমুদয়ের পরামর্শ প্রদান করিতে কুণ্ঠিত হইল না। মানসিংহ সমুদায় অবগত হইয়া রাজগণের নিকটে যুদ্ধ-ঘোষণা করিয়া দূত প্রেরণ করেন। যাহারা মানের প্রলোভনে বা ভয়ে অভিভূত হইয়াছিল, তাহারা বাধ্য হইয়া মোগল সেনাপতির আনুগত্য স্বীকার করায় মানসিংহ তাহাদিগকে সাদরে গ্রহণ করিলেন। ঈশা খাঁ বহুপূর্ব্বেই ভূঞাদল পরিত্যাগ করিয়া মোগলচরণে আত্মসমর্পণ করে। অতঃপর মহারাজ প্রতাপাদিত্য, রাজা কেদার রায়, রাজা মুকুন্দ রায়, চাঁদ গাজি ব্যতীত আর সকলেই মোগলের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল। ১৬০৬ খ্রীঃ অব্দের যুদ্ধে মহারাজ প্রতাপাদিত্য অমানুষিক বীর্য্য প্রকাশ করিয়াও দেশ রক্ষা করিতে পারিলেন না; পরে ধৃত হইয়া পিঞ্জরাবদ্ধ হন। পরে মুকুন্দ রায়ের রাজধানী ভূষণা আক্রমণ করিয়া মোগল সেনাপতি উহা বিধ্বস্ত ও হস্তগত করেন। তৎপর মোগল বাহিনী ক্রমে অগ্রসর হইয়া বিক্রমপুর আক্রমণ করে।

মানসিংহ শ্রীপুরের সন্নিকটবর্ত্তী হইলে তৎকর্ত্তৃক কতিপয় দূত কেদার রায়ের নিকট প্রেরিত হয়। ঐ দূতের নিকট তরবারি ও শৃঙ্খল প্রদান করিয়া বলিয়া দেওয়া হয় যে, যদি কেদার রায় শৃঙ্খল গ্রহণ করিয়া বাদশাহের আনুগত্য স্বীকার করেন, তবে তদ্বিরুদ্ধে কোন কার্য্য করা হইবে না;

অন্যথা তরবারি গ্রহণ করিয়া যদি শত্রুতার ভাব প্রকাশ করেন, তবে অবশ্য যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে বিনাশ করা হইবে। এতদ্ভিন্ন ঐ দূতের সহিত মানসিংহ কেদার রায়ের নিকট অতিরিক্ত একখানি লিপি প্রেরণ করেন। তাহাতে একটী শ্লোক লিখিত ছিল। দূত তরবারি, শৃঙ্খল ও ঐ লিপি লইয়া কেদার রায়ের নিকট উপস্থিত হয়।

দূত প্রভু-নির্দ্দিষ্ট বাক্যানুসারে যাবতীয় বিষয় কেদার রায়ের নিকট বর্ণনা করিয়া মানসিংহের প্রদত্ত পত্রও তাঁহাকে প্রদান করিল। কেদার রায় প্রথমে লিপি পাঠ করিলেন, উহাতে এইরূপ লেখা ছিল,—

"ত্রিপুর মঘ বাঙ্গালী কাক কুলী চাকালী
সকল পুরুষ মেতৎ ভাগ যাও পালায়ী।
হয়-গজ-নর-নৌকা কম্পিতা বঙ্গভূমি
বিষমসমরসিংহো মানসিংহঃ প্রয়াতি॥

ইহা পাঠান্তে কেদার রায় উহার উত্তর-সূচক আর একটী শ্লোক লিখিয়া দূতের হস্তে দিয়া বলিলেন, "যাও দূত, তোমার প্রভুকে গিয়া বল আমি তরবারি গ্রহণ করিলাম। তাঁহার যতদূর ক্ষমতা থাকে, তাহা প্রয়োগ করিতে তিনি যেন কুণ্ঠিত না হন। হয় তাঁহার অস্ত্রাঘাতে আমার স্কন্ধ ছিন্ন হইবে, নতুবা তৎপ্রদত্ত এই অসির আঘাতে তাঁহারই মুণ্ড দেহ-বিচ্যুত হইয়া এই যুদ্ধের অবসান হইবে।" কেদার রায় উত্তরসূচক যে শ্লোকটী মানসিংহের নিকট প্রেরণ করেন, তাহা আমরা এই স্থলে উদ্ধৃত করিলাম,—

"ভিনত্তি নিত্যং করিরাজকুম্ভং বিভর্ত্তি বেগং পবনাতিরেকম্।
করোতি বাসং গিরিরাজশৃঙ্গে তথাপি সিংহঃ পশুরেব নান্যঃ॥"(১)

মানসিংহ, কেদার রায়ের বিবরণ শ্রবণ করিয়া, তৎক্ষণাৎ শ্রীপুর অবরোধ করিবার জন্য সৈন্যগণকে আদেশ প্রদান করিলেন। আমরা এইস্থলে,

---

(১) বৈদ্যবংশীয় বিশ্বনাথ সেন চাঁদ ও কেদার রায়ের সময়ে মুন্সীর কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, এই প্রত্যুত্তরের শ্লোকটী পণ্ডিত বিশ্বনাথের বিরচিত, যথা—

"চাঁদ রায় কেদার রায় বিক্রমপুর শাসক।
বুরীবংশী বিশ্বনাথ তৎপত্র লেখক॥"

৺গোপালকৃষ্ণ কবীন্দ্র কৃত অম্বষ্ঠ সম্পাদিকা দেখ।

কেদার রায়ের অন্যান্য কয়েকটী বিষয় উল্লেখ করিয়া পশ্চাৎ মানসিংহের সহিত তাঁহার সমরাভিনয়ের বর্ণনা করিব।

কেদার রায়ের গুরু গোসাঞি ভট্টাচার্য্য এই সময় রাজসকাশে উপস্থিত হইয়া, তাঁহাকে যুদ্ধ ক্ষান্ত করিবার জন্য অনেক উপদেশ প্রদান করেন। কিন্তু কেদার, তাঁহার সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া কোন দৈবানুষ্ঠান দ্বারা যাহাতে তাঁহার মঙ্গল হয়, সেই কার্য্যে ব্রতী থাকিবার জন্য গুরুদেবকে অনুরোধ করেন। অগত্যা গুরুদেব তৎকার্য্যসাধনমানসে, মৃন্ময়ী কালী প্রতিমা নির্ম্মাণ করাইয়া তদর্চ্চনায় প্রবৃত্ত হইলেন। গ্রহবৈগুণ্যবশতঃ কেদার রায়ের এই কার্য্য হিতের পরিবর্ত্তে অহিতকর হইয়া দাঁড়াইল।

প্রবাদ আছে, গোসাঞি ভট্টাচার্য্য, তান্ত্রিক বীরাচারী সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। তাঁহারা বৈদিকাচারী বা বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের মত কোন পূজা বন্দনাদি প্রায়ই অনাহারে অনুষ্ঠান করিতেন না। তন্ত্রানুযায়ী অনুষ্ঠান দ্বারা ইষ্টদেবীকে অন্ন ব্যঞ্জন উৎসর্গ করিয়া ঐ প্রসাদ গ্রহণান্তর, নিশীথে পুনরায় দেবীর পূজা-বন্দনাদি করিতেন। গোসাঞি, এই দিবসে আহার করিয়া, রাত্রিতে রাজ-নিয়োজিত পূজা করিতে যাওয়ায়, কেদার রায় রুষ্ট হন, অথচ গুরুদেবকে কিছু বলিতেও সাহস পান না। গুরুদেব পূজান্তে কেদার রায়কে আশীর্ব্বাদ নির্ম্মাল্য গ্রহণ জন্য, বার বার ডাকিয়া পাঠান, কিন্তু কেদার রায় আর তৎসমীপে আগমন করেন না। তৎকারণ কেদারের উপর গোসাঞির ক্রোধের উদ্রেক হয়। তিনি বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার অর্চ্চনার উপর শিষ্যের নিতান্ত অভক্তি জন্মিয়াছে, এই কারণে সে আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিল না। তখন আত্মক্ষমতার পরিচয় প্রদান জন্য তিনি সমবেত লোকমণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, দেখ, তোমাদের রাজার এই দেবার্চ্চনার প্রতি বড়ই সন্দেহ ও ঘৃণা জন্মিয়াছে। আমি তাহার কল্যাণকামনায়, নানা উপদেশ প্রদান করিয়া, বাদশাহের আনুগত্য স্বীকার করিতে বলিলাম। সে যখন তাহা শুনে নাই, তখনই জানিয়াছি, তাহার কল্যাণ অসম্ভব। অতঃপর যদিও এই দৈব-কার্য্যাদির অনুষ্ঠান করিয়া, তাহার রক্ষার্থ চেষ্টা করিয়াছিলাম, তাহাও সে উপেক্ষা করিল। অতএব তাহার অশুভ অনিবার্য্য। তোমরা আমার প্রভাব স্বচক্ষে অবলোকন কর। এই বলিয়া শাণিত খড়্গ তুলিয়া প্রতিমার বুকে আঘাত করিলেন। তৎক্ষণাৎ ঐ ক্ষত স্থান হইতে অবিরল ধারায় রক্ত পতিত হইতে লাগিল। দর্শকগণের আর আশ্চর্য্যের ইয়ত্তা রহিল না। গোসাঞি

তৎক্ষণাৎ কোথায় চলিয়া গেলেন। এই সকল সমাচার অচিরে কেদার রায় শুনিতে পাইয়া ভয়ে অভিভূত হইলেন। পরে গুরুদেবের শরণাপন্ন হইবার অভিপ্রায়ে বাহিরে আসিয়া তাঁহার অনেক অন্বেষণ করিলেন, কিন্তু আর দর্শন পাইলেন না।

বহুকাল হইতে বিক্রমপুরে দুইটী কালীক্ষেত্র পীঠস্থানবৎ পূজিত হইয়া আসিতেছে। তন্মধ্যে একটী চাঁচুরতলার "ঠারিণ বাড়ী" অপরটী মাঐসারে "দিগম্বরী বাড়ী" বলিয়া প্রসিদ্ধ। প্রবাদ চাঁচুরতলাতে ব্রহ্মানন্দগিরি এবং মাঐসারে গোসাঞি ভট্টাচার্য্য সিদ্ধি প্রাপ্ত হন। (১) ঐ উভয় স্থানে নানাস্থান হইতে, হিন্দুরা আসিয়া পূজা বন্দনাদি করিয়া থাকে। ঐ সময়ের তান্ত্রিক গুরুগণ সম্বন্ধে আরও নানারূপ উপাখ্যান শুনিতে পাওয়া যায়। সর্ব্বানন্দ ঠাকুর মেহার প্রদেশে দশমহাবিদ্যা সিদ্ধি করিয়া, উহার মাহাত্ম্য বৃদ্ধি করণাস্তে স্বয়ং সর্ব্ববিদ্যাবলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। বিল্বপুকুর-নিবাসী রামচন্দ্র

---

(১) ব্রহ্মানন্দ সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক ঘটনা শ্রুত হওয়া যায়, তন্মধ্যে যেটী বর্ত্তমান ইতিহাস সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য তাহাই বিবৃত করা হইল।

ব্রহ্মানন্দ তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের এক মহাসিদ্ধ পুরুষ বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। চাঁদ রায় ও কেদার রায় তাঁহাকে যথোচিত ভক্তি করিতেন। তান্ত্রিক গুরুর শিষ্য হইলেও আচার বিষয়ে তাঁহারা উঁহার সমুদয় অনুশাসন মানিয়া চলিতেন না, বিশেষতঃ মদ্যের প্রতি তাঁহাদের বিশেষ দ্বেষ ছিল।

একদা গিরিঠাকুর কারণপানে বিভোর হইয়া রাজসভাতে সমাগত হন। রাজগণ তাঁহাকে পরমযত্নসহকারে গ্রহণ ও পদবন্দনা করিয়া, মদ্যপানের জন্য একটুকু ব্যঙ্গোক্তি করেন। তাহাতে ব্রহ্মানন্দ বলেন দেখ তোমরা যে কার্য্য অসঙ্গত বিবেচনা কর, তাহা আমি সঙ্গত বিবেচনা করি, কিন্তু সাধারণের জন্য এই নিয়ম প্রয়োজনীয় নয়, তাহাও স্পষ্ট বলিতে পারি, কারণ যে ব্যক্তি যে বিষয়ে শক্ত তাহার পক্ষে মাত্র উহা ব্যবস্থা হইতে পারে। তোমাদের এমনকি ক্ষমতা আছে, যে মদ্যপান করাইয়া আমাকে অজ্ঞান করিতে পার।

রাজগণ তাঁহার কথা শুনিয়া বহু পরিমাণে সুরার আয়োজন করিয়া তাঁহাকে পান করাইতে লাগিলেন। ব্রহ্মানন্দ অধঃকরণ করিতে আরম্ভ করিলে আর মদ্যে কুলাইয়া উঠিল না। পরে ভাটিখানা হইতে উত্তপ্ত সুরা আসিতে লাগিল, গিরিঠাকুরও অনবরত পান করিতে লাগিলেন। এইরূপে ক্রমে তিন দিন গত হইলে, রাজগণ আশ্চর্য্য মানিয়া গিরিঠাকুরের পদে পতিত হইয়া স্ব স্ব অত্যাচারানুষ্ঠানের জন্য ক্ষমাপ্রার্থী হইলেন।

গিরি বলিলেন যাহা হইবার হইয়াছে, এখন আমি প্রস্রাব করিব, কিন্তু যেদিকে উহা প্রবাহিত হইবে সে স্থানের যাবতীয় স্থাবর জঙ্গম পুড়িয়া ভস্ম হইয়া যাইবে। তাঁহার কার্য্যকলাপ-দৃষ্টে এই কথার প্রতি কাহারও অবিশ্বাসের উদ্রেক হইল না। তৎকালে রাজধানীর পশ্চিমদিকে

বন্দ্যোপাধ্যায় ভট্টাচার্য্য* সিদ্ধিলাভ করিয়া "বেলপুকুরে ভট্টাচার্য্য" নামে প্রসিদ্ধ হন। আমরা এই সকল বিষয়ের আলোচনা করিয়া প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করায় হয় ত পাঠক মহোদয়গণ বিরক্ত হইতে পারেন, তবে তাঁহাদের বিবেচনা করা উচিত যে প্রাচীন বিবরণ সংগ্রহ করা বড়ই সুকঠিন ব্যাপার। বহু চেষ্টায় যতটুকু জানা যায়, তাহা পরিত্যাগ করিতে, কোন মতেও ইচ্ছা জন্মে না। এখন উহা পরিত্যাগ করিলে, ভবিষ্যতে আর পাইবারও সম্ভাবনা অতি অল্প। এই কারণে অস্বাভাবিক গল্প বলিয়া বিবেচিত হইলেও উহার কতকটা না রাখিয়া পারা যায় না। কেদার রায় মাতৃনিদেশ ক্রমে এই পীঠস্থানবৎ চাঁচুরতলার নিকটে অপর একটী বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহা অদ্যাপি রাজাবাড়ী বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই স্থানে বাস করিয়া, অনায়াসে দেবীর অর্চ্চনা করা যাইতে পারিবে, এই মানসেই ঐ বাড়ী নির্ম্মিত হয়। রালফ্ফিচ্

এক শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্য ছিল, সকলে তাঁহাকে তথায় আনয়ন করিয়া প্রস্রাব করিবার স্থান দেখাইয়া দেওয়ায় ব্রহ্মানন্দ প্রস্রাব করিতে লাগিলেন। সকল লোক আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া দেখিল, বাস্তবিক অরণ্যে যেন দাবানল উত্থিত হইয়া অচিরে সমুদয় পোড়াইয়া ভস্মে পরিণত করিয়া দিল। ঠাকুর অন্তর্হিত হইলেন।

তদবধি এই স্থান পোড়াগাছা নামে অভিহিত হয়। তৎপর ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ প্রভৃতি এই স্থানে বাসস্থান নির্ম্মাণ করেন। মুলফৎগঞ্জের থানা, পোষ্টাফিস এই স্থানে পরে উঠিয়া আইসে। এই স্থান পূর্ব্বে একটী প্রধান বন্দর ছিল। রাজনগর ও এই স্থান একসময়ে কীর্ত্তিনাশার গর্ভস্থ হয়।

পোড়াগাছাবাসী, বৈদ্য শিয়াল সেনের বংশধরগণ সমাজে পরিচিত। এখানকার ত্রিপুরগুপ্তগণ পূর্ব্বে কালীয়াবাসী ছিলেন, তাঁহাদের শেষ বংশধর রাজা রাজবল্লভের পুত্র দেওয়ান রামদাসের সহিত ও লালা রাম প্রসাদের পুত্র লালা জয়নারায়ণের সহিত দুই কন্যার বিবাহ দিয়া, পোড়াগাছা গ্রামে বাসস্থাপন করেন। রাজপাশা গ্রাম নদী কর্ত্তৃক ভগ্ন হইলে ধন্বন্তরি রামসেনের বংশধরগণ এই গ্রামে বাস করিতেন। অধুনা এই বৈদ্যগণ কুরাশী দাসারতা ও কোটাপাড়া ও কোয়রপুর বাস করিতেছেন।

* গোসাঞি ভট্টাচার্য্যের দৌহিত্র রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার পিতার নাম যদুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মাতার নাম লীলাবতী। এই বেলপুকুরের ভট্টাচার্য্যবংশীয়গণ মধ্যে কয়েক ঘর বিক্রমপুর আসিয়া বাস করেন; জপসা, রাজনগর, নড়িয়া এই তিন গ্রামে বহুকাল তাঁহাদের বংশধরগণ বাস করিয়া নদী কর্ত্তৃক গ্রাম বিনষ্টের পর অধুনা সিরজল, পালং, লোংসিংহ, চান্দনী, জুরানী প্রভৃতি গ্রামে বাস করিতেছেন। ইঁহাদের বহু কুলীন ব্রাহ্মণ, ঘটক শিষ্য আছে।

ভ্রমণবৃত্তান্ত পুস্তকে লিখিয়াছেন, এই রাজাবাড়ীর ১৮ মাইল ব্যবধানে ঈশা খাঁ মসনদ আলির রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল।

এই রাজাবাড়ীর অনতিদূরে "কেশার মার দীঘী" নামে এক বৃহৎ জলাশয় ছিল। প্রবাদ, কেশা অথবা কেশবের মাতা, পতি-পুত্রহীনা হইয়া, পতি-কুলের প্রভু চাঁদ রায়ের আশ্রয়ে থাকিয়া জীবন যাপন করে। বিক্রমপুর অঞ্চলে সিকদার বা নফর বলিয়া এক সম্প্রদায় কৃতদাস আছে। তাহাদের রমণীরা বিপন্ন অবস্থাতে এইরূপে প্রভুকুলের আশ্রয় গ্রহণান্তর, প্রভুপরিবারের অপরাপর রমণীর ন্যায়, স্বচ্ছন্দে কালাতিবাহিত করিয়া থাকে। এই সিক-দার শ্রেণীর মধ্যে যাহারা প্রভুপুত্রের 'ধাই ভাই' হইতে পারে, তাহারা বড়ই সম্মান বোধ করিয়া থাকে। ধাই ভাই বিক্রমপুরে 'আতা ভাই' বলিয়া প্রসিদ্ধ। কেদার রায় জন্মগ্রহণ করিলে পর, কেশার মাকে তাঁহার ধাত্রী-পদে নিযুক্ত করিয়া, রাজা পুত্রের প্রতিপালনভার তৎকরে ন্যস্ত করেন। কেদার রায় বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইলে পর, ধাত্রীর ইচ্ছা-নুসারে এই বৃহৎ জলাশয় খনন করাইয়া তদ্দারা উৎসর্গ করাইয়াছিলেন। এই নিমিত্ত উহার নাম হয় "কেশার মার দীঘী।" আরও প্রবাদ, কেশার মা যতদূর হাঁটিয়া যাইতে পারিবে, ততদূর পর্য্যন্ত এই সরোবর খনিত হইবে বলিয়া কেদার রায় প্রতিশ্রুত হন। তদনুসারে ধাত্রী প্রায় ১ মাইল ব্যাপী স্থান হাঁটিয়া অতিক্রম করার পর অঙ্গ কর্ত্তৃক বাধা প্রাপ্ত হইয়া গমনে ক্ষান্ত হয়। এজন্য দীঘীও এক মাইল ব্যাপী স্থান লইয়া খনিত হইয়াছিল। অদ্যাপি উহার ভগ্নাবশেষ বর্ত্তমান রহিয়াছে। উহার তীরস্থ বন্দর "দীঘীর পাড়ের হাট" নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

বিক্রমপুরান্তর্গত শ্রীপুর গ্রামে কেদার রায়ের রাজধানী ছিল। বস্তুতঃ চাঁদরায় উহার প্রতিষ্ঠা সাধন করিয়াছিলেন। উক্ত রায়গণের জ্ঞাতি যাঁহারা অদ্যাপি বিক্রমপুর বাস করিতেছেন, তাঁহারাও রায় উপাধি ধারণ করিয়া আসি-তেছেন। দক্ষিণ বিক্রমপুরের দেভোগ গ্রামে এবং উত্তর বিক্রমপুরের মূলচর গ্রামে ইহাদের জ্ঞাতি আছে বলিয়া জানা যায়। এজন্য নিঃসন্দেহে বোধ হয় যে, চাঁদরায়ের ঊর্দ্ধতন পুরুষে কেহ শ্রীপুর বাস করিতেন এবং সেই মহাত্মা হইতেই কতিপয় শাখা প্রশাখা বাহির হইয়াছিল। অন্যথা তাঁহাদের জ্ঞাতিবংশ বর্ত্তমান থাকিবার সম্ভাবনা কি? তবে চাঁদ রায় ক্ষমতাশালী হইয়া শ্রীপুরের যথার্থ শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছিলেন।

শ্রীপুর বিক্রমপুরের রাজধানী ছিল। তথায় রাজপ্রাসাদ, সৈনিকাবাস, বিচারালয়, কারাগার, কোষাগার, প্রভৃতি রাজোচিত যাবতীয় বন্দোবস্ত ছিল। তৎসন্নিহিত আলাফুল-বাড়িয়া স্থানে বিস্তৃত বন্দর এবং কোটীশ্বর নামে দেবালয় ছিল। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি তৎকালে কীর্ত্তিনাশা নামে কোন নদীর অস্তিত্ব পর্য্যন্ত ছিল না। একটী ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী বিক্রমপুরের মধ্য দিয়া বক্রভাবে চলিয়া গিয়াছিল। উহা কালীগঙ্গা নামেও পরিচিত। ঐ নদীতীরে শ্রীপুর রাজধানী বিদ্যমান ছিল। জনশ্রুতিতে প্রকাশ, এক ক্রোর টাকা বেদিমূলে প্রোথিত করিয়া তদুপরি এই কোটীশ্বর সংস্থাপিত * এবং স্থাপিত স্থানটীও ঐ অভিধান প্রাপ্ত হয়। এই কেটীশ্বরপল্লীতে রায়গণকর্ত্তৃক দশমহাবিদ্যা এবং স্বর্ণনির্ম্মিত দশভুজা দুর্গামূর্ত্তি সংস্থাপিত হইয়াছিল। সর্ব্বসাধারণের নিকট উহা "স্বর্ণময়ী" নামে প্রসিদ্ধ হন। এই দেবালয় অথবা দেবমূর্ত্তি এখন কিছুই

* যদি কাহারও মনে কোটি টাকার উপর দেবমূর্ত্তি সংস্থাপন সম্বন্ধে সন্দেহ হয়, তবে তাঁহাদের প্রবোধার্থে বলিতেছি, তাঁহারা একবার, সোমনাথদেব ও জগন্নাথদেবের অতুল ঐশ্বর্য্যের কথা স্মরণ করিয়া দেখুন। এই সম্পত্তির অধিপতি বলিয়া, বিগ্রহদ্বয়কে মুসলমান হস্তে কত লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছিল। প্রাচীন কাল হইতেই কোন দেবতাপ্রতিষ্ঠাকালে তন্নিম্নে বেদিমূলে অন্ততঃ কএক খণ্ড অষ্টধাতু ও অষ্টরত্ন দিবার প্রথা চলিয়া আসিয়াছে। প্রবাদ বাক্যেও এইরূপ দেবতার গৃহে কতজন কত অর্থ পাইয়াছে, এইরূপ কথা শুনা যায়। প্রবাদ—বাখরগঞ্জ জিলার কোন কায়স্থ জমিদারবংশের পূর্ব্বপুরুষ ছাগ বিক্রয় করিতে গিয়া বাগেরহাট অঞ্চলে কোন দেবগৃহ নদী কর্ত্তৃক ভগ্ন হইবার সময় তন্মধ্য হইতে বিপুল মুদ্রা পতিত হইতেছে দেখিয়া, অজপাল নৌকা হইতে তটে নামাইয়া দিয়া, সেই নৌকাতে ঐ মুদ্রা ভরিয়া লইয়া যান এবং তদ্দ্বারা ক্রমে বহু বিষয় সম্পত্তি ক্রয় করিয়া জমিদার হইয়া বসেন। নড়াইলের জমিদার সুবিখ্যাত রামরতন রায় ও হরনাথ রায়ের সহিত মনোমালিন্য প্রযুক্ত তাঁহাদের পিতৃব্য পুত্রদ্বয় দুর্গাদাস রায় ও গুরুদাস রায় গৃহবহিষ্কৃত হন। পরে তাঁহাদের পৈতৃক সংস্থাপিত রূপাপাতের কালীদেবীর বেদির নিম্নে লক্ষাধিক টাকা পাইয়া, দুর্গাদাস ও গুরুদাস তদবলম্বনে রতন বাবুর সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। যখন এইরূপ আরও অনেক কথা শুনা যায়, তখন চাঁদ ও কেদার রায়ের মত একজন স্বাধীন রাজার পক্ষে এক কোটি টাকার উপর বিগ্রহ সংস্থাপন কিছু আশ্চর্য্য নহে।

বিদ্যমান নাই। তবে রায়বংশের দুই চারিটী কীর্ত্তির ক্ষীণরেখা বর্ত্তমান থাকিয়া আজিও তাঁহাদের নাম সময়ে সময়ে দর্শকগণকে স্মরণ করাইয়া দেয়। তাহার বিবরণ যতদূর পারিলাম, পাঠক মহোদয়গণের কৌতুহলনিবৃত্তির জন্য তাহাই নিম্নে বিবৃত করা হইল।

কাচকির দরজা। উহা এক বৃহৎ রথ্যা—ইদিলপুরের নিকটস্থ বুড়ীর হাট ও দেওভোগ স্থান হইতে উহার এক শাখা আরম্ভ হইয়া বিক্রমপুর ভেদ করিয়া উত্তর দিকে বরাবর ধলেশ্বরী নদীর তট পর্য্যন্ত উপস্থিত হইয়াছিল। অপরটি মেঘনা নদীর তট হইতে আরম্ভ করিয়া পশ্চিম দিকে বরাবর পদ্মাতট পর্য্যন্ত প্রসারিত হয়। রাস্তা দুইটি বক্র গতিতে নানা জনপদ ঘুরিয়া ফিরিয়া যাওয়ায় বিক্রপুরের অধিকাংশ গ্রামের যাতায়াতের সুবিধা ছিল। সেনরাজগণের সময়ে যে সমস্ত রাস্তা প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহার কতকাংশ এই কাচকির দরজার সহিত পরে সংযোজিত হয়। সুতরাং এই রাস্তার সমুদয় ভাগ রায় মহাশয়দের নিজকৃত নয়। এই পথটির অধিকাংশ এখন কীর্ত্তিনাশা নদীর কুক্ষিগত হইয়াছে। স্থানে স্থানে যাহা আছে, তাহা পরে কোথাও বা ভগ্ন হইয়া ক্ষেত্রে, কোথাও বা লোকালয়ে, এবং অবশিষ্ট শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যানীতে পরিণত হইয়াছে। ১৪।১৫ বৎসর অতীত হইল পালং ষ্টেসন্ হইতে যে রাস্তাটি ভোজেশ্বর পর্য্যন্ত প্রস্তুত হইয়াছিল উহার অধিকাংশ এই কাচকির দরজার উপর দিয়া চলিয়া আসিয়াছিল। এই রাস্তাটির উৎপত্তি সম্বন্ধে অবগত হওয়া যায় যে, কেদার রায়ের মাতার অদৃষ্ট গণনা করিয়া কোন জ্যোতির্ব্বিদ বলিয়াছিল মৎস্যের কণ্টক বিদ্ধ হইয়া তাঁহার মৃত্যু সংঘটন হইবে। এই কারণে কেদাররায় রাণীর জন্য কণ্টকহীন মৎস্যের ব্যবস্থা করেন। কাচকির গুড়া নামে একপ্রকার ক্ষুদ্র মৎস্য নদীতে সর্ব্বদা পাওয়া যায়। সেই মৎস্য পদ্মা, মেঘনা, ধলেশ্বরী নদীতে প্রত্যহ ধৃত হইয়া যাহাতে সুবিধামত রাণীর জন্য পৌছিতে পারে, তন্নিমিত্ত চাঁদরায় কর্ত্তৃক এই রাস্তার পত্তন আরম্ভ হইয়া কেদার রায়ের সময়ে পরিসমাপ্ত হয়। কথার মূলে যাহাই থাকুক, কাচকিমৎস্য ধৃত করিবার ব্যপদেশে উহার সৃষ্টি এই কিংবদন্তীই চলিয়া আসিয়াছে, এবং এইজন্য রাস্তার নামও "কাচকির দরজা" হইয়াছিল। প্রবাদ সত্য হউক বা মিথ্যা হউক, কিন্তু এই চতুর্দ্দিক্ প্রসারিত পথগুলি যখন পূর্ণাবয়বে, বিক্রমপুরে বিদ্যমান ছিল, তখন [illegible] যে বর্ত্তমান অধিবাসিগণের অপেক্ষা অধিক সুখস্বচ্ছন্দে যাতায়াত করিত, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

কেদার বাড়ী।—কেদার রায় কার্ত্তিকপুর, ও বিক্রমপুর এই পরগণাদ্বয়ের সন্ধিস্থলে এক প্রকাণ্ড বাড়ী নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। উহার চতুর্দ্দিক সুপ্রশস্ত পরিখা দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়াছিল; রাশীকৃত ইষ্টকাবলী সংগৃহীত হইয়া কয়েক খানা অট্টালিকার ভিত্তি পর্য্যন্ত গ্রথিত হয়; কিন্তু উহা আর সম্পন্ন হইয়া উঠে না। আজি পর্য্যন্তও সর্ব্বসাধারণে ঐ স্থানকে কেদার বাড়ী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। এই গ্রাম পালং ষ্টেসনের অন্তর্গত। বর্ত্তমান সময়ে কেদার বাড়ীতে কতিপয় ধনী সাহা সন্তান বাস করিয়া কেদার বাড়ীর নাম উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে।

রাজাবাড়ীর মঠ।—কীর্ত্তিনাশা নদীরতটে এতাদৃশ প্রাচীন কীর্ত্তি আর এখন দেখা যায় না। উত্তাল তরঙ্গময়ী স্রোতস্বতী খরবেগে যেমন একদিকে চলিয়া যাইতেছে, তেমন আবার ভ্রূকুটী সঞ্চালন করিয়া এক একবার ঐ উচ্চ মন্দিরের প্রতি বক্র দৃষ্টিপাত করিতেও কুণ্ঠিত হইতেছে না। পরবর্ত্তী কত অত্যুচ্চ সুদৃশ্য হর্ম্ম্যরাজী, কীর্ত্তিনাশার উদরস্থ হইয়া অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে, জানি না, কেদার রায়ের কি পুণ্যবলে এই মঠ অদ্যাপি বর্ত্তমান থাকিয়া তাঁহার যশের একটি ক্ষীণ জ্যোতিঃ লোকলোচনের সম্মুখে ধরিয়া দিতেছে। এই মঠ নির্ম্মাণ সম্বন্ধে যতদূর বিবরণ অবগত হওয়া যায়, উহা গ্রন্থান্তরে প্রকাশ করা যাইবে।

চাঁদ ও কেদার সম্বন্ধীয় বিস্তৃতবিবরণ বারভূঞা প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হইয়াছে, এস্থলে অতঃপর সংক্ষেপে মানসিংহের সহিত কেদার রায়ের যুদ্ধ বিবরণ প্রদান করা হইল।

দেশীয় প্রবাদ মতে কেদার রায় গুপ্ত ঘাতকের হস্তে প্রাণত্যাগ করেন, কিন্তু আকবরনামা-প্রণেতা বলেন, যুদ্ধক্ষেত্রেই এই বীরবরের পতন হয়। আমরা ঐ অংশ উক্ত গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

কেদার রায় ও ইশাখাঁ এক দলবদ্ধ হইয়া, মোগল বাদসাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন, এই সময়ে ১৬০২ খ্রীষ্টাব্দে বিপুলবাহিনী ও রণতরী সুসজ্জিত হইয়া ব্রহ্মপুত্র, মেঘনা ও কালীগঙ্গার তটও সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। মোগল সেনাপতি বাজ বাহাদুর বিপুল আয়োজন করিয়া কেদার রায়কে দমন করিবার জন্য শ্রীপুর উপনীত হন। কিন্তু কেদার রায়ের বিক্রম সহ্য করিতে না পারিয়া মানসিংহের নিকট আরও সৈন্য সাহায্য চাহিয়া পাঠান। রাজা

যান তৎক্ষণাৎ একদল সুশিক্ষিত সৈন্য রাজবাহাদুরের সাহায্যার্থে প্রেরণ করিয়া স্বয়ং পশ্চাৎ অনুসরণ করেন। মানসিংহ রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া কেদার রায়কে পরাস্ত করেন বটে, কিন্তু তাহার রাজ্য গ্রহণ করেন নাই।* সম্ভবতঃ সেই যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া কেদার রায়ের গৃহাধিষ্ঠাত্রী শীলাময়ীদেবীকে মানসিংহ জয়পুর লইয়া যান এবং স্বয়ং কেদার রায়ের একটী কন্যাকে গ্রহণ করেন। †

আকবর বাদসাহের রাজত্বের ৪৮ বৎসরে ১৬০৩ খ্রীঃ পুনরায় কেদার রায় মোগলের বশ্যতা অস্বীকার করেন, এই সময়ে তাহার সহিত ইশা খাঁর বিবাদ হয়। ইশা মোগল পদে মস্তক অবনত করিয়াছে, এক মাত্র মগরাজকে অবলম্বন করিয়া কেদার বঙ্গমাতার স্বাধীনতা সংরক্ষণপ্রয়াসে বদ্ধপরিকর। কেদার রায় পাঁচশত জাহাজ সংগ্রহ করিয়া মোগল সৈন্যাধ্যক্ষ কিলমককে অবরোধ করিয়া ফেলিলেন, এবার ঘোরতর যুদ্ধ বাধিল, মোগল সেনা পরাস্ত হইয়া পলায়ন করিতে অসমর্থ হইয়াছিল, কিন্তু মানসিংহ পুনবায় বহু সৈন্য সহ যুদ্ধস্থলে উপনীত হইয়া শ্রীপুর অবরোধ করিলেন। আকবরনামাতে দেখা যায়, কেদার রায় ভয়ানক যুদ্ধে আহত হইয়া ধৃত হন—কিন্তু মানসিংহের নিকট আনীত হইবার অল্পকাল পরেই তিনি সেই নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়া সুরলোকে প্রস্থান করেন। ‡

বারভূঞাগণের মধ্যে যদি কাহাকেও সর্ব্ব প্রথম আসন প্রদান করা কর্ত্তব্য হয়, আমাদের বিবেচনায়, তবে তাহা বিক্রমপুরের কেদার রায়েরই প্রাপ্য। ঈশা খাঁ মসনদ আলী সর্ব্ব প্রধান ছিলেন বটে, কিন্তু পরিণামে তিনিও মোগল পতাকামূলে মস্তক অবনত করিতে বাধ্য হইলেন। অধিকাংশই তৎপথাবলম্বন করেন, করিলেন না কেবল তিনটী মহাপ্রাণ, বিক্রমপুরের কেদার রায়, ভূষণার মুকুন্দরায় ও যশোহরের প্রতাপাদিত্য। আকবরনামাতে কেদার রায় ও মুকুন্দরাম রায়ের নাম স্পষ্ট উল্লেখ আছে, জানিনা প্রতাপাদিত্যের নাম উহাতে উল্লেখ নাই কেন। এমন কি, এখন দেখা যায়, যে শীলাময়ী মানসিংহ বঙ্গদেশ হইতে জয়পুর স্বীয় রাজধানীতে লইয়া যান,

---

* ইলিয়ট ১০৩ পৃষ্ঠা বালাম ৩।

† যোগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য প্রেরিত প্রবন্ধ, সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকা। জয়মেয়পুরের ইতিহাস দেখ।

‡ ইলিয়ট ১১৩ পৃষ্ঠা আকবর নামা। এই যুদ্ধ যেস্থানে হয়, উহা ফতেজঙ্গপুর নামে পরিচিত।

তাহাও প্রতাপাদিত্যের গৃহদেবী নন, কেদার রায়ের গৃহাধিষ্ঠাত্রী দেবী বলিয়াই অবগত হওয়া যায়। (১)

নয়পাড়ার চৌধুরী।

বারভূঞার পতনের পর, তাহাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি নানা বিভাগে বিভক্ত হইয়া আবার বহু জমিদারের অভ্যুদয় হয়। কেদার রায়ের জমিদারী নিজ বিক্রমপুর নয়পাড়ার ভরদ্বাজ গোত্রজ বৈদ্য চৌধুরীদের হস্তগত হয়। প্রথম জমিদার রঘুনন্দন অতি সচ্চরিত্র এবং বীর পুরুষ ছিলেন। এজন্য মানসিংহ তাঁহার হস্তেই ঐ জমিদারী ন্যস্ত করেন। রঘুনন্দন জমিদারী লাভ করিয়া স্বদেশের যথেষ্ট উন্নতি সাধন করিয়া তুলেন। নানাস্থান হইতে নানা শ্রেণীর সম্ভ্রান্ত লোক আসিয়া এই সময়ে তথায় বাস করিতে আরম্ভ করেন। বিশেষ বৈদ্য সম্প্রদায় মধ্যে তাঁহার স্থান অতি নিম্নে ছিল, এজন্য যশোহরাঞ্চল হইতে বহু সম্ভ্রান্ত বৈদ্য আনিয়া স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠা করেন। (২) ক্রমে দুই তিন পুরুষ পর যাঁহারা এই বংশে অবতীর্ণ হইতে লাগিলেন, তাঁহারা কিন্তু আর কাহাকেও সম্মানী বলিয়া গ্রাহ্য করিতেন না। নানারূপ অত্যাচার অবিচার চলিতে লাগিল। শুনা যায়, ইঁহারা সাড়ে সাত শত ঘর লোককে ক্রীতদাসের কার্য্যে নিযুক্ত করেন, ভদ্রলোকের বাটীর নিকট দিয়া, অশ্লীল সারি গাহিয়া বাইচের নৌকা চালাইতেও ইতস্ততঃ করিতেন না।

অত্যাচারের মাত্রা ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া সকল শ্রেণীর উপরই চলিতে লাগিল, একদা তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা, যাঁহাদের পদধূলি বাড়ীতে পড়িলে, আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিতেন, সেই সকল স্বজাতীয়দিগের এখন আর তাঁহারা মনুষ্য বলিয়াই বিবেচনা করিতেন না।

দিন কাহারও সমানে যায় না, এদিকে বৈদ্য বংশের মধ্যে যাঁহারা ইতিপূর্ব্বে কেবল কৌলীন্য ও ঔষধ সম্বল করিয়া এতকাল জীবনযাপন করিতেছিলেন, এখন আবার তাঁহাদের বংশধরেরা অনেকেই সংস্কৃত শ্লোকাবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া, পারস্য ভাষায় মনোনিবেশ করিলেন। অচিরাৎ ফলও ফলিল,

(১) ঐতিহাসিক চিত্র ১৩১৪সন ১৬পৃঃ। কেদাররায় প্রতিষ্ঠিত ভুবনেশ্বরী মূর্ত্তি নদীয়া জেলার কালীগঞ্জ থানার অন্তর্গত লাখরিয়ার চৌধুরীদের বাটীতে অদ্যাপি প্রতিষ্ঠিত আছে। দশমহাবিদ্যা শক্তি-মধ্যে উহা চতুর্থ স্থানীয়।

(২) এই রঘুনন্দন চাঁদ কেদার রায়ের প্রধান অমাত্য ও রঘুনন্দন চৌধুরী ইদিলপুরে কায়স্থ চৌধুরীগণের পূর্ব্বপুরুষ সেনাপতি ছিলেন। ভ্রমবশতঃ তদ্বংশীয় কমল শরণকে সেনাপতি বলা হইয়াছিল।

তন্মধ্যে অনেকে উচ্চ রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইতে লাগিলেন। এই সময় তাঁহাদের নিকট জমিদারের অন্যায় অত্যাচার বা আদব, কায়দা ভাল লাগিত না। বোধ হয় সকলেই অনুমান করিতে পারেন যে, মানব যতই উন্নতিলাভে অগ্রসর হয়, ততই তাহার দৃষ্টি তদপেক্ষা উন্নতবানের প্রতি পতিত হয়; আর যাহাতে তাহারা সেই পদ লাভ করিতে পারে, তজ্জন্য বদ্ধপরিকর হয়।

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সেই সময়ে বিক্রমপুরস্থ ব্রাহ্মণ সম্প্রাদায় মধ্যে পাণ্ডিত্যের প্রাধান্য ব্যতীত বৈষয়িক বিষয়ে বড় কেহ লিপ্ত ছিলেন না। স্বাবলম্বনে এই সময়ে বৈদ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে রূপসার রায়, সোনারঙ্গেরও সোমকাটের ভূঞা বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন।

ক্রমে এই কয়েক ঘর একত্রিত হইয়া জমিদারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইলেন। জমিদারও নূতন অভ্যুত্থিত প্রজাগণকে দমন জন্য নিত্য নূতন অত্যাচারের সৃষ্টি করিতে লাগিলেন, উভয় পক্ষের দাঙ্গা হাঙ্গামায় বিক্রমপুর উৎসন্ন হইতে বসিল। এই কথা ক্রমে ঢাকার সুবেদারের কর্ণগোচর হইল। এই সময়ে সুবেদার সরফরাজ খাঁর প্রতিনিধি ঘালেব আলি খাঁ ঢাকার নায়েব এবং যশোবন্ত রায় তাঁহার দেওয়ান ছিলেন।

প্রজারা জমিদারের বিরুদ্ধে নানারূপ অত্যাচারের, আবার জমিদার পক্ষ হইতে তাহাদের বোট ও বাইচের নৌকা ভঙ্গের বাবদ অভিযোগ উপস্থিত হইল, প্রমাণে জমিদার পরাস্ত হইলেন। সমবেত প্রজামণ্ডলীর কাতর ক্রন্দনে, ঘালেব আলি খাঁ ও যশোবন্ত রায় ব্যথিত হইলেন, প্রজারা বলিল, যদি অতঃপর আর জমিদারের হস্তে তাহাদিগকে সমর্পণ করা হয়, তবে আর তাহাদের মান সম্ভ্রম রক্ষা পাইবার উপায় নাই। ইহার পর রাজাজ্ঞাও প্রচার হইল, অতঃপর যে কোন প্রজা জমিদারের অধীন হইতে আপন বিষয় সম্পত্তি নবাব সরকারের সেরেস্তায় নাম পত্তন করিবে, তাহাদের সহিত জমিদারের আর কোন সংস্রব থাকিবে না। যেমন হুকুম প্রচার, অমনি সাত শত আবেদনকারী আসিয়া স্ব স্ব জমা জোত সম্বন্ধে নবাব সেরেস্তায় নাম পত্তন করিয়া লইল। (১)

সেই দিন হইতে নয়পাড়া রাজলক্ষ্মী চির অন্তর্হিত হইলেন, এ দিকে বিক্রমপুরের প্রজামণ্ডলীর স্বাধীনতা লাভের সহিত দিন দিন উন্নতি বৃদ্ধি হইতে

(১) এই সময়ে এই জমিদার বংশে রঘুরাম রায় চৌধুরী বর্ত্তমান ছিলেন, কিন্তু অতি বৃদ্ধ বিধায় তাঁহার পুত্রগণই কর্তৃত্ব করিতেন। তাহাদের দোষে এই বংশের অধঃপতন হয়। বৈদ্যঘটক-কারিকায় উল্লেখ আছে। "বিক্রমপুরে রঘুরাম রায় সমাজপতি।"

লাগিল। আজ বিক্রমপুরের যে এতটা উন্নতি দেখা যায়, তাহার প্রধান কারণ জমিদারের হস্ত হইতে নিস্কৃতি লাভ। দেওয়ান যশোবন্ত রায়ের রাম রাজ্যের ফল বিক্রমপুরবাসিগণ অদ্যাপি সম্ভোগ করিয়া সেই মহাত্মাব আত্মাব চির কল্যাণ কামনায় কীর্ত্তিনাশার উভয় তীর হইতে সমভাবে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছে। আর যে বীরগণেব স্বার্থত্যাগ ও উদ্যোগে এই দাসত্বের মোচন, তাঁহারাও সমুদয় বিক্রমপুরবাসিগণের নিকট অদ্যাপি দেববৎ প্রতীয়মান হইতেছেন।

বিক্রমপুর এইরূপে জমিদারগণের হস্ত ভ্রষ্ট হইয়া দুই ভাগে বিভক্ত হয়। তন্মধ্যে যে অংশ হুজুরি সেরেস্তার অন্তর্গত থাকে, তাহার রাজকর আদায় হইত ১৭২৮ খ্রীঃ অব্দের বন্দোবস্তে ১৪২৬১ টাকা ও ১৭৬৩ খ্রীঃ অব্দের বন্দোবস্তে বৃদ্ধি পাইয়া ২৪৫৬৫ টাকা। উহার তহশীলদার ছিলেন রাজারাম, (১) জপসীর কৃষ্ণরাম দেওয়ানের ভ্রাতা। অপর অংশের নাম বিক্রমপুর সাহাবন্দর; বিক্রমপুর পরগণা ও তদন্তর্গত সাহাবন্দর নামে একটী সায়র মহাল হইতে উহার রাজস্ব আদায় হইত ১২৫০০০ হাজার টাকা,সাহাবন্দর দক্ষিণ বিক্রমপুরান্তর্গত নরিকুল গ্রামের পশ্চিম দক্ষিণ, দেভোগ গ্রামের দক্ষিণ ও জপসা গ্রামের উত্তর কালীগঙ্গাতটে বড় জাকাল বন্দর ছিল। দেশী বড় বড় মহাজন ও পার্টুগীশ; ইংরেজদের কুঠী পর্য্যন্ত এই স্থানে বাণিজ্যব্যপদেশে নির্ম্মিত হইয়াছিল। কালীগঙ্গা মজিয়া গেলে এই বন্দরেরও পতন হয়। এইস্থলে ফৌজদার অবস্থান করিতেন। মসজিদ তৎসংসৃষ্ট পারস্যভাষা শিক্ষার জন্য একটী মখতব ছিল। এই মখতব বিক্রমপুরের বহু গ্রামের জনগণ পারস্যভাষা অধ্যয়ন করিতেন। নদী কর্ত্তৃক দেভোগ ও নরিকুল ভগ্ন হইবার পূর্ব্বপর্য্যন্ত এই মসজিদ ও একটী ইষ্টকনির্ম্মিত সেতুর ভগ্নাবশেষ এই স্থানে দৃষ্ট হইত। বহু ব্যবসায়ী স্বর্ণবণিক কর্ম্মকার সাহা, ও জোলা (মোসলমান বস্ত্রবয়নকারী) মুসলমান জাতীয় কাগজ প্রস্তুতকারী (কাগজী) বন্দর থাকা সময়াবধি গ্রামধ্বংসের শেষ পর্য্যন্ত এইস্থানে বাস করিয়াছে। পরে বহু ব্রাহ্মণ কায়স্থও এই গ্রামে বসতিবাটী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে কায়স্থ জাতীয় সরকার উপাধিধারী ব্যক্তিগণের নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁহারা নবাব সরকারে কার্য্য করিয়া যথেষ্ট অর্থসংগ্রহ করেন ও তদ্বারা কতিপয় ইষ্টকালয় ও মঠ নির্ম্মাণ করিয়া কিঞ্চিৎ কীর্ত্তির সাক্ষী রাখিয়াছিলেন। আজিও ভূম্যধিকারিগণের বহু কাগজ পত্রে সাহাবন্দরের নাম

(১) ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর পঞ্চম রিপোর্ট ঢাকা নেয়াবতী দেখ।

উল্লেখ দেখা যায়। যথা সরকার সোণার গাঁ চাকলেজাহাঙ্গীর নগর পরগণে বিক্রমপুর সাহাবন্দর। এতদ্ভিন্ন প্রদবন্দব নামে এইরূপ একটী বন্দর বিক্রমপুরের অন্তর্গত ছিল, প্রদবন্দরের নামও বহু প্রাচীন কাগজ পত্রে দৃষ্ট হয়। বিক্রমপুর খাস হইলে মোসলমান রাজসরকারে আয় দাড়ায় মোট ১৪৯৫৩৬ টাকা। এতদ্ভিন্ন জমিদারী বলিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহার সদর রাজস্ব অতি অল্পই ছিল। যাহার আয় বর্ত্তমান সময়ে ৩ পাউণ্ড বা ৪৫৲ টাকা। এতদ্ভিন্ন আর সমুদয়ই তালুকদারাতে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে।

ফতেয়াবাদ।

যে ফতে আলীর নামানুসারে ফতেয়াবাদের নামকরণ হয়, ষ্টুয়ার্ট তাঁহাকে মোগলপক্ষের সুন্দীপের শাসনকর্ত্তা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। জনষ্টিভেন্স কর্ত্তৃক ১৬৯৫ খ্রীষ্টাব্দে যে পুস্তক ভাষান্তরিত হইয়া মুদ্রিত হয়, তাহাতে স্পষ্ট উল্লেখ আছে, ফতেখাঁ পর্টুগীস্ মাটুস কর্ত্তৃক নিযুক্ত ও সুন্দীপের শাসনভারপ্রাপ্ত হন। পরে বিশ্বাসঘাতক ফতেখা মোগলের পক্ষাবলম্বন করিয়া খ্রীষ্টীয়ানদিগের নিধন সাধন করে। ফতেখাঁর পতাকা মধ্যে লিখিতছিল "ঈশ্বরের অনুগ্রহে ফতেখাঁ সুন্দীপের অধীশ্বর, খ্রীষ্টীয়ানের রক্তপাতকারী ও পর্টুগীস্ জাতির বিনাশকর্ত্তা।" পরে কিন্তু পর্টুগীসদের হস্তেই তাঁহার নিধন সাধন হয়।

সরকার ফতেয়াবাদের অন্তর্গত সুন্দীপ ও সাহাবাজপুর পরগণাদ্বয় যেমন মধ্যবর্ত্তী সরকার বাকলা অতিক্রম করিয়া মেঘনা নদ মধ্যে বিদ্যমান ছিল, ঠিক তদ্রূপ পরগণে বোজের গোউমেদ পুর পরগণা সরকার বাকলার নিকটবর্ত্তী হইলেও উহা সরকার সোনারগাঁ মধ্যে রাখিয়া তদুত্তরবর্ত্তী সরকার বাজুহায়ের অধীন ছিল। বাদসাহী আমলে সদর রাজস্ব আদায়ের একটা নির্দ্দিষ্ট সীমা ছিল না। যে পরগণা যে সরকারের অধীন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তত্রত্য পরগণার নিযুক্তিয় কানুনগোও ক্রোড়ীগণ উহার রাজস্ব আদায় করিয়া, সরকারের প্রধান কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট প্রেরণ করিতেন।

সরকার ফতেবাদের অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহালগুলি ছিল। অরসিয়াচার্জ্জ, ফুলচৌল, চেলন, ভাগলপুর, বাখাবিয়া, তেলিহাটী, চরণলক্ষ্মী, চরহাটী, হাবেলীফতেয়াবাদ, লবনের শুল্ক, হজরতপুর, হাটের খাজনা, রসুলপুর, সন্দীপ সিরহরগরল, সিবিমালী, সিরোহী, সুদ দেওয়া, সোয়ামীল (জালালপুর)

সাহাবাজপুর, খড়গহর, কুশদিয়া, কওসা, মাকরগগঞ্জ, মসুনদাড়, ভিরণপুর, ক্ষুদ্র তালুকদার, নাকতুল্যামির, হাজাবহাটী, ইউসকপুর; এই ৩১ মহালের ও পরগণাপ মোট রাজস্ব ৭১৬৯৫৫৭ দাম * ৯০০ অশ্বারোহী ও ৫০৭০০ পদাতিক সরবরাহ হইত।

ফতেয়াবাদ ও মুকুন্দরায়।

মুকুন্দরায়ের পূর্ব্বপুরুষেরা কিরূপে এই ফতেয়াবাদ প্রদেশে প্রথম আগমন করেন, তাহার কোন বিবরণ প্রাপ্ত হওযা যায় না। আমাদের অনুমান হয়, যে সময়ে চাঁন্দরায় ও কেদার রায়ের পূর্ব্বপুরুষেরা বিক্রমপুর আগমন করেন, মুকুন্দ রায়ের পূর্ব্ববর্ত্তীগণও সেই সময় পূর্ব্ববঙ্গে আগমন করিয়াছিলেন। বিক্রম-পুরের রায় রাজগণ চন্দ্রদ্বীপের রায় রাজগণ ও ফতেয়াবাদের রায় রাজগণ সকলেই 'দে' উপাধিধারী কায়স্থ ছিলেন। আমাদের বিবেচনায় এই তিন রাজবংশের মূল পুরুষ একই ব্যক্তি হইবেন, কেবল আমাদের যে এই মত, এমন নয়, এতৎ সম্বন্ধে ভারতী ও বালক পত্রিকায় † যাহা লিখিত হইয়াছিল, তাহা পাঠ করিলেই বুঝা যায় যে, অন্যান্য লেখকের মতেও এইরূপ অনুমান সপ্রমাণিত হইয়াছে। আমরা নিম্নে ঐ অংশটুকু উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"বক্তিয়ার খিলিজী যখন বাঙ্গালা দেশ আক্রমণ করিয়া প্রবল বাত্যারূপে পূর্ব্ববঙ্গের দিকে আপতিত হইতেছিল, অনুমান হয়, সেই সময় বাকলা চন্দ্রদ্বীপের দনুজ মর্দ্দন রায়ের বংশাবলী অথবা নিকট সম্পর্কীয় জ্ঞাতি কি কুটম্বগণ ছড়াইয়া পড়িয়া পূর্ব্ববঙ্গের স্থানে স্থানে কয়টী জমীদারী সৃষ্টি করেন। কালে সেই জমিদারীর সৃষ্টি-কর্ত্তাগণ আপন আপন গৃহবিচ্ছেদ, সমাজ বিরোধ প্রভৃতি কারণে নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পড়েন। দনুজ মর্দ্দন রায় বঙ্গজ কায়স্থ, এই সমস্ত ক্ষুদ্র জমিদারীর প্রবর্ত্তয়িতাগণও বঙ্গজ কায়স্থ শ্রেণীভুক্ত।"

যদিও বক্তিয়ার খিলিজী পূর্ব্ববঙ্গের সীমান্তেও পদার্পণ করেন নাই, তথাপি দে বংশীয় রাজগণ যে, একই বংশোদ্ভব ছিলেন, তাহা আমরাও স্বীকার করি।

এই সময়ে ভূষণাপটী বলয়াই একটা সাধারণ সমাজের সৃষ্টি হয়। বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণ মধ্যে ভূষণাপটী বলয়া এক সম্প্রদায় বর্ত্তমান দেখা যায়। এতদ্ভিন্ন তিলি, বণিক, কর্ম্মকার শ্রেণীর মধ্যেও ভূষণাই পটী বলয়া একটা সমাজ আছে।

এই রাজবংশের উৎসাহে ভূষণাতে বিবিধ প্রকার শিল্প কার্য্যের উৎকর্ষ

---

* ৪০ দামে একটাকা।

† ১২৯৯ সালের ফাল্গুন মাসের ভারতী দেখ।

সংসাধিত হয়। ভূষণার অন্তর্গত সাতৈরের শীতলপাটী সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। এতদ্ভিন্ন বহুদিন পর্য্যন্ত ঐ বিভাগের বোয়ালমারির কার্পাস ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রসাদাৎ ইয়োরোপে আমদানী হইত। ফতেয়াবাদের স্থপতিরা এক সময়ে পূর্ব্ববঙ্গের যাবতীয় হর্ম্ম্যমালা ও মঠাদি নির্ম্মাণ কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া স্ব স্ব গুণপনার যথেষ্ট পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছে। স্বাধীন প্রদেশে ব্যবসায়ের ও শিল্প কার্য্যের যে কত উন্নতি হইতে পারে, তৎকালীন ভূষণা, ফতেয়াবাদের প্রতি দৃষ্টি করিলেই তাহার সম্যক পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যয়।

হিজরী ৯৮৮ সনে (১৫৭০ খ্রীঃ অব্দে) সম্রাট আকবর সাহেব বঙ্গাধিকারের সমকাল মোরদ খাঁ পাঠান সুবেদার দাউদের অধীনে থাকিয়া ফতেয়াবাদ শাসন করিতেন। পরে মেদিনীপুর ও জলেশ্বরের মধ্যবর্ত্তী মোগলমারি (তুকারো) নামক স্থানে মোগল পাঠানে যে যুদ্ধ হয় (১৫৭৫), তাহাতে পাঠানেরা পরাস্ত হইয়া কটকে প্রস্থান করিলে পর হিজলীর (উড়িষ্যার) খাষার খাঁ, ফতেয়াবাদের মোরাদ খাঁ এবং সাতগাঁর মীরজানজাদ খাঁ সহজেই মোগল রাজের বশ্যতা স্বীকার করে। মোগল সেনাপতি হোসেন কুলিখাঁর মৃত্যু হইলে পর, পাঠান কোতোল খাঁ এই অবসরে পুনরায় বাঙ্গলা আক্রমণ করিল, বিশেষতঃ যে সকল প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তারা তাহার অবাধ্য হইয়া মোগল রাজের শরণাপন্ন হইয়াছিল, তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়াই তাহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল।*

কোতল খাঁ প্রথমতঃ সাতগাঁর শাসনকর্ত্তা মীরজানজাদ খাঁকে আক্রমণ করিলেন, মীর সাহেব আত্মরক্ষার্থ পলাইয়া ছলিমাবাদ (সেলিমাবাদে) প্রস্থান করিলেন, তথায়ও আপনাকে নিরাপদ জ্ঞান না করিয়া দর্পনারায়ণ (কন্দর্পনারায়ণ) প্রতাপ বার ভিরিঙ্গির আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এদিকে কোতল খাঁর আক্রমণের অব্যবহিত পূর্ব্বেই ফতেয়াবাদের শাসনকর্ত্তা মোরাদ খাঁর মৃত্যু হইল। এই সময় মুকুন্দরায় তথাকার এক সামান্ত জমিদার বলিয়া পরিচিত। মোরাদের সহিত তাহার বিশেষরূপ সখ্য ভাব থাকায় মুকুন্দ তাহার পুত্রগণের যথোচিত সহায়তা করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন।

কোতল খাঁ ফতেয়াবাদ আক্রমণ করিল, মুকুন্দরায় মোরাদের সৈন্তগণের সহিত নিজ দলবল মিলাইয়া কোতল খাঁর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন। এ

* আকবর নামা মুকুন্দরায় জমিদার দেখ।

দিকে মোগলসেনাপতি রাজা মানসিংহও ঠিক এই সময়ে বহুসংখ্যক সৈন্য সহিত বাঙ্গালায় প্রবেশ করিয়া কোতলু খাঁর প্রতিকূলে উপস্থিত হইলেন। অনন্যোপায় হইয়া পাঠানেরা বঙ্গদেশ পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় উড়িষ্যায় পলায়ন করিল।" †

মানসিংহ জানিতে পারিলেন, মুকুন্দ মোগল পক্ষাবলম্বী হইয়া পাঠানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন, এজন্য নিতান্ত পরিতুষ্ট হইয়া ফতেয়াবাদের অন্য কোন মুসলমান শাসনকর্ত্তা নিয়োগ না করিয়া, মুকুন্দরায়কে রাজোপাধি প্রদান করিয়া ঐ স্থানের সম্পূর্ণ ভারার্পণ করিলেন। রাজা মুকুন্দ অকৃতজ্ঞ ছিলেন না, তিনি পূর্ব্ব শাসনকর্ত্তা মোরাদ খাঁর পরিবারবর্গকে যথোচিত ভূবৃত্তি প্রদান করিয়া যাহাতে তাহারা সুখ-স্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকিতে পারে, তাহার উপায় করিয়া দিলেন। এইরূপে নামে মাত্র মোগলাধীনে থাকিয়া যখন মুকুন্দ রায় ভূষণায় কর্তৃত্ব করিতেছিলেন, তৎকালে উহার যেরূপ উন্নতি সাধিত হইয়াছিল, তাহা পূর্ব্বেই বর্ণনা করা গিয়াছে। অতঃপর কিন্তু তিনি বিদ্রোহী দলে যোগদান করেন।

মানসিংহ বাঙ্গালায় আসিয়া যেরূপভাবে বিদ্রোহী জমিদারদিগকে দমন করিয়াছিলেন, তাহার বার বার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। ভূষণাও মোগল সেনাপতির হস্তগত হইল। দিনের পর ক্রমের সহিত যুদ্ধ করিয়াও মুকুন্দ রায় আত্মরক্ষা করিতে পারিলেন না। অগণিত মোগলবাহিনীর সহিত মুষ্টিমেয় যোদ্ধা লইয়া যতক্ষণ পারিলেন, তিনি আপন ভুজবলের পরিচয় দিতে ক্ষান্ত হইলেন না, পরিণামে সম্মুখ সমরে জীবন-বিসর্জ্জন করিয়া ভবিষ্যবংশীয়গণও এইরূপে স্বদেশের উদ্ধার কল্পে জীবন ত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত না হয়, এই উপদেশ প্রদানচ্ছলে যেন সেই শূরাত্মা অমরধামে গমন করিলেন।* প্রবাদ এই সময়ে এক মোগলসেনাপতি মুকুন্দরায়ের কন্যার সতীত্বনাশের উদ্যোগ করিলে, রাজনন্দিনী হস্তস্থিত অসিদ্বারা সেই আততায়ীর বক্ষ বিদ্ধ

---

† ডাক্তার ওয়াইজ অথবা অন্য কোন ইতিহাসলেখক মুকুন্দ রায় সম্বন্ধে কোন বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন নাই। আমরা পারস্য ভাষায় লিখিত মূল "আকবর নামা" অনুবাদ করাইয়া এসম্বন্ধে যতদূর জানিতে পারিয়াছি, তাহাই এস্থানে উল্লেখ করিলাম।

* এই যুদ্ধ জয় স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপে করিয়া রণস্থানের নাম মানসিংহ ফতেপুর বা ফতেজঙ্গপুর রাখিয়াছিলেন। অধুনা উহা মাদারিপুর সবডিভিসনের অন্তর্গত একটী পরগণা।

করিয়া দেন ; পরে স্বীয় বক্ষে অস্ত্রাঘাত করিয়া ইহলোক হইতে সুরলোকে প্রস্থান করেন। পামর সেনাপতিও আর জীবিত থাকিল না ; অনন্ত নরকে তাহার স্থান নির্দ্দেশ হইল। মুকুন্দের ছয় পুত্র, তন্মধ্যে শত্রুজিৎ ও শিবরামের নাম অবগত হওয়া যায়। শত্রুজিৎ পুনরায় স্বাধীন হইবার উদ্যোগী হওয়ায়, বাদশাহের সৈন্যকর্ত্তৃক ধৃত হইয়া দিল্লীতে প্রেরিত ও তথায় হত হন। তাঁহার বংশধরগণ অদ্যাপি যশোহর শত্রুজিৎপুরে বাস করিতেছেন। তৎপর সমগ্র ফতেয়াবাদের অন্তর্গত চাকলে ভূষণা সংগ্রামসাহের করায়ত্ব হয়।

দীঘলবালা গ্রামে প্রাণনাথ ভট্টাচার্য্যের গৃহের ১৬০৮ নং তায়দাদও গঙ্গা-রামপুরের পরেশনাথ স্মৃতিতীর্থের গৃহে ১৯৩৩ নং তায়দাদ ১৫৮৩ খ্রীষ্টাব্দের) যাহা মুকুন্দরাম ব্রহ্মত্র প্রদান করেন, তাহাও তৎপুত্র শত্রু জিতের নিষ্কর দান-পত্র যাহা সম্পাদিত হয়, উহা যশোহরের কালেক্টরীর ১২০৯ সনের তায়দাদ কাগজপত্র দৃষ্টে জানা যায়।

মুরুকমানের আইনই আকবরী পাঠে অবগত হওয়া যায়, ১৫৭৪ খ্রীষ্টাব্দে মোরাদ খাঁ মুনিম খাঁর আদেশে ফতেয়াবাদ চাকলা অধিকার করে। আমাদের বিবেচনায় তৎসময়ে ফতেয়াবাদ মোগলের নাম মাত্র অধিকারে আইসে, বাস্তবিক তৎসময়েও পাঠানদের হস্ত হইতে ফতেয়াবাদ বিচ্যুত হয় নাই।

কালাপাহাড়।

আকবর বাদসাহের শাসনের ২৮ বৎসরে (১৫৮৩ খ্রীষ্টাব্দে) খানি আজাম খাঁ সাহের পক্ষ হইতে বিদ্রোহ দমনে নিযুক্ত ছিলেন। মাওম কাবুলীও কতুলু লোহানী (কুতুল খাঁ) বিদ্রোহের নায়ক ছিলেন। কালীগঙ্গার নিকট উভয় পক্ষের যুদ্ধ আরম্ভ হয়।

রাজকীয় সৈন্য শত্রুসৈন্যের সম্মুখীন হইয়া একমাস পর্য্যন্ত যুদ্ধ করেন। প্রত্যহই উভয় পক্ষের যুদ্ধ ঘটিত। উভয়পক্ষই সমভাবে সাহস প্রদর্শন করেন, কিন্তু পরিশেষে বিদ্রোহীদলের মধ্যে ভয়ের সঞ্চার হওয়ায় মোগলপক্ষ জয়লাভ করে। এই সময়ে বিদ্রোহীদলের অন্ততর নেতা কাজীজাদা ফতেয়াবাদ হইতে অনেকগুলি যুদ্ধজাহাজ ও কামানবন্দুক লইয়া স্বপক্ষের সাহায্যার্থে উপস্থিত হন ; কিন্তু বাদসাহী সেনার গোলাঘাতে প্রাণত্যাগ করেন। মাসুম খাঁর আদেশে কালাপাহাড় কাজীজাদার অধীনস্থ সৈন্যের নায়ক পদে বরিত হন। (ইলিয়ট কৃত আকবরনামা ৬১ পৃষ্ঠা।)

পূর্ব্ববঙ্গে বহু প্রস্তর-নির্ম্মিত দেবমূর্ত্তি ভগ্নাবস্থায় দৃষ্ট হয়। উহাদের মধ্যে কাহারও নাসিকা, কাহারও বা কর্ণ, মুণ্ড ইত্যাদি ভগ্ন দেখা যায়, তাহা কালাপাহাড়ের কুকীর্ত্তি বলিয়াই অবগত হওয়া যায়। সম্ভবতঃ এই সময়েতেই ফতেয়াবাদের আধিপত্য লাভ করিয়া কালাপাহাড় এই কুকর্ম্মের অবতারণা করে। উড়িষ্যার স্বাধীনতা ইহার হস্তে নষ্ট হয়।

কালাপাহাড় ব্রাহ্মণনন্দন; পূর্ব্বনাম রাজু; পরে কোন মোসলমান আমিরের কন্যার রূপ লাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া মোসলমান ধর্ম্ম পরিগ্রহ করে। কেহ কেহ বলেন যে, জোর করিয়া তাহার সহিত মোসলমান কন্যা বিবাহ দেওয়া হয়।

ইলিয়টকৃত আইন আকবরির অনুবাদ পাঠে অবগত হওয়া যায়, মাসুম কাবুলী, বাদসাহের সহিত যখন পরাস্ত হইয়াছেন, তখনই ফতেয়াবাদে আশ্রয় পাইয়াছেন। এই হিসাবে ফতেয়াবাদ বাদসাহের বিপক্ষদলের এক প্রধান আড্ডা ছিল বলিয়া অনুমিত হয়।

সংগ্রামসাহ।

প্রায় সার্দ্ধ দ্বিশত বৎসর অতীত হইলে, বঙ্গদেশে সংগ্রাম সাহ নামে এক ব্যক্তি প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। পূর্ব্ববঙ্গের নানাস্থানে আজিও তাঁহার পরিচয়ের কতিপয় চিহ্ন বর্ত্তমান থাকিয়া, তাঁহাকে স্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। যশোহর, ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ ও নোয়াখালি প্রভৃতি জেলা, সংগ্রামের, প্রধানতঃ লীলাক্ষেত্র ছিল বলিয়া বোধ হয়। এতদ্ভিন্ন সুদূর মারবাড় বা যোধপুরের ইতিবৃত্ত পাঠ করিলেও সংগ্রামের গুণগ্রামের ও শৌর্য্যবীর্য্যের পরিচয় পাইয়া স্বতঃই তাঁহার ধন্যবাদ করিতে ইচ্ছা হয়। কেহ যেন মনে না করেন যে, আমরা একটী প্রবাদমূলক বাক্যকে কতকগুলি অসার উপকরণে সজ্জিত করিয়া পাঠকগণের ক্ষণিক মনস্তুষ্টি বিধানে প্রয়াস পাইতেছি। বাস্তবিক প্রকৃত বিষয়ে সত্য ঘটনা পরম্পরার উপর নির্ভর করিয়াই আমরা এই প্রস্তাবের ভিত্তিসংস্থাপন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। তবে তাহাতে কতদূর কৃতকার্য্য হইব, তাহা ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত রহিয়াছে। আজ কেবল মহাত্মা সংগ্রামের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস পাঠকগণের অবগতির জন্য এই স্থলে উল্লেখ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

কবিকণ্ঠহারকৃত সদ্বৈদ্যকুলপঞ্জিকা, মহামহোপাধ্যায় ভরত মল্লিককৃত চন্দ্রপ্রভা, আলমগীর-নামার আংশিক অনুবাদ হইতে উদ্ধৃত 'কলিকাতা রিভিউ'র কতিপয় প্রবন্ধ, মিঃ বিভারেজ কৃত বাখরগঞ্জের ইতিহাস এবং মহাত্মা কর্ণেল

টড্ কৃত রাজস্থানের ইতিহাস এবং অন্যান্য কতিপয় প্রবন্ধাবলম্বনে এই প্রস্তাব সংক্রান্ত উপকরণগুলি সংগৃহীত হইয়াছে। এক্ষণে যথাক্রমে এতদ্বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে প্রয়াস পাইতেছি।

যে সময়ে দিল্লীর মোগল বাদশাহগণ, ভারতে রাজ্যবিস্তার করিয়া একাধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন, তৎসময়ে বঙ্গদেশের অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহার একটুকু নমুনা প্রদান না করিলে, আমাদের বর্ত্তমান প্রস্তাবের একাংশ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। এই জন্য তৎসমসাময়িক কিছু বিবরণ এস্থলে উল্লেখ করা গেল।

মোগল রাজত্বের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত বঙ্গদেশ প্রতিনিধি স্বরূপ মুসলমান নবাবগণের দ্বারা বঙ্গদেশ শাসিত হইত বটে, কিন্তু তৎকালে সাধারণ প্রজা ও দেশরক্ষণাবেক্ষণের ভার দেশীয় জমিদারগণের উপরই অধিক পরিমাণে নির্ভর করিত।

এই সময়ে বঙ্গের অন্যান্য প্রদেশের অবস্থা একরূপ নিরাপদ হইলেও পূর্ব্ব-দক্ষিণ বঙ্গ দুইটি বিদেশীয় জাতির দ্বারা বড়ই বিপর্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। উহার একদল আরাকানবাসী মগ ও অপর দল ইউরোপের নরপিশাচ পর্টুগীজ দস্যু। এতদুভয় দল কখনও একত্রভাবে কখনও বা বিভিন্নভাবে বিভক্ত হইয়া, পূর্ব্বদক্ষিণ বঙ্গকে একরূপ জনহীন করিয়া তুলিয়াছিল। মুসলমান বাদসাহকুলতিলক আকবর বাদসাহের সময়ে এই উপদ্রবের প্রথম সূত্রপাত হয়; এই জন্য বাদসাহ, সাহাবাজ নামক একজন সুদক্ষ সেনাপতিকে এই দস্যুদলন-মানসে পূর্ব্ববঙ্গে প্রেরণ করেন। সাহাবাজ খাঁ মেঘনা নদীর মোহানায় সেনা-নিবেশ করিয়া স্বীয় নামানুসারে এই স্থানকে সাহাবাজপুর আখ্যা প্রদান করেন।* সাহাবাজ—১৫৮৫ খ্রীঃ অব্দ হইতে ১৫৮৬ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত এই কার্য্যে ব্রতী থাকিয়া মগ ও পর্ত্তুগীজদিগের প্রভাব অনেক পরিমাণে তিরোহিত করিয়াছিলেন। তৎপর আর এই জন্য তথায় কোনরূপ সৈন্য রাখা অনাবশ্যক বিবেচনা করিয়া বাদসাহ তৎপ্রদেশীয় ভূম্যধিকারিগণের উপর দস্যুদমনের ভার দিয়া একরূপ নিশ্চিন্ত থাকেন।

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন সমুদ্রতীরস্থ অধিকাংশ অধি-

* বিভারেজ কৃত বাখরগঞ্জের ইতিহাসের ১৩৩ পৃষ্ঠা দেখ। অধুনা সাহাবাজপুর উত্তর ও দক্ষিণ এই দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া দুইটী পরগণায় পরিণত হইয়াছে। বাখরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত ভোলা সবডিভিসন্ এই পরগণার মধ্যে স্থাপিত।

বাসীরা হিন্দু ছিল এবং সুন্দরবন অঞ্চলে বহুজনাকীর্ণ জনপদ সকল বর্ত্তমান ছিল। সম্ভবতঃ কোনরূপ সংক্রামক-রোগের প্রকোপ অথবা অন্য কোন দৈব দুর্ঘটনার আয়ত্ত হইয়া তাহারা ঐ সকল স্থান পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। আইন-ই-আকবরী পাঠে জানা যায়, ১৫৮৪ খৃঃ অব্দে একটি প্রবল বন্যার উৎপত্তি হইয়া প্রায় দুই লক্ষ লোক স্রোতোবেগে ভাসাইয়া লইয়া যায়। উক্ত গ্রন্থে এই ঝড় বৃষ্টির সম্বন্ধে যাহা লিখিত আছে, তাহার অনুবাদ নিম্নে প্রদান করা গেল। † তৎপরে দুর্ভাগ্যের সহচর মহামারীতেও বহুলোক কাল-কবলিত হওয়ায় জনহীনতার মাত্র বর্দ্ধিত হয়। মিঃ গ্রাণ্ট উল্লিখিত বিষয়গুলি পর্য্যালোচনা করিয়া বলিয়াছেন, এই সকল কারণে, বিশেষতঃ পরিশেষে মগ ও পর্ত্তুগীজদিগের উৎপাতেই সমুদ্রতীর জনশূন্য হইয়া পড়িয়াছিল। সম্ভবতঃ শেষোক্ত কারণটি পূর্ব্বটির অপেক্ষাও ভয়ঙ্কর ছিল।

তৎসময়ে মগদিগকে এরূপ নরপিশাচ বলিয়া সাধারণের মনে ধারণা হইয়াছিল যে, তাহারা কোন পল্লীতে প্রবেশ করিলেই, তত্রত্য অধিবাসীরা অন্য-স্থানীয় লোকদিগের চক্ষে জাতিভ্রষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইত। এই কারণে, সন্দীপ ও দক্ষিণ সাহাবাজপুরবাসী শূদ্র ও নরসুন্দরেরা, ভিন্ন দেশের হিন্দুর জলস্পর্শ করিতে পারে না। পূর্ব্ববঙ্গে এইরূপ মঘে-তিলি মঘে-কামার মঘে কুমার প্রভৃতি বর্ত্তমান আছে, যাহারা অন্য সম্প্রদায়ের সহিত কোনরূপেও মিশিতে পারে না।

মিঃ বিভারেজ বাখরগঞ্জের ইতিহাসে এবিষয়ের একটি সুন্দর উদাহরণ দিয়াছেন। তাহা পাঠে অনুমিত হয় যে, মঘেরা যদি কখনও সদিচ্ছাপ্রণোদিত হইয়াও কোন কার্য্য করিতে অগ্রসর হইত, তথাপি তাহার ফল লোকে কু

† "বাকলা সরকার সমুদ্রতীরে অবস্থিত। বর্ত্তমান পাতসাহের (আকবরের) রাজত্বের ঊনবিংশ বৎসরে একদিন অপরাহ্ন তিনটার সময়ে সমুদ্রজল বাড়িতে আরম্ভ হয়। অল্পক্ষণের মধ্যেই এমন জলপ্লাবন হয় যে, সমস্ত বাকলা সরকার জলমগ্ন হইয়া যায়। বাকলার রাজা সেদিন একস্থানে নিমন্ত্রণে গিয়াছিলেন, সমুদ্রের জল ক্রমাগত বৃদ্ধি হইতেছে দেখিয়া, তিনি একখানি নৌকায় আরোহণ করেন, কিন্তু পরে জলমগ্ন হন। রাজপুত্র কতকগুলি অনুচরসহ একটি উচ্চ মন্দিরের চূড়ায় আরোহণ করেন। সাধারণে যেখানে একটু উচ্চস্থান পাইল, সেই স্থানেই আশ্রয়-গ্রহণ করিল। ক্রমাগত পাঁচ ঘণ্টা ভয়ানক ঝড়বৃষ্টি ও অশনিপাত হইয়াছিল। ঘরবাড়ী সমস্ত ভাঙ্গিয়া, চুরিয়া স্রোতোবেগে প্রবল বায়ুর প্রকোপে কোথায় চলিয়া গেল। কেবল দেবমন্দির ব্যতীত আর কিছুরই চিহ্ন রহিল না। প্রায় দুইলক্ষ লোক জীবন বিসর্জ্জন করিল।"

আইন আকবরী।

ব্যতীত স্থ বলিয়া বিশ্বাস করিত না। সাহেব লিখিয়াছেন, আড়িয়াল খাঁ নদীর তীরবর্ত্তী ইমজানপুরের দাসেরা বলে তাহাদের একটী স্ত্রীলোক নদীতে স্নান করিতেছিল, সেই সময়ে একজন মঘ নদীতট দিয়া স্থানান্তরে যাইতেছিল। মঘকে দেখিয়া ঐ রমণী তাহার দৃষ্টি হইতে আপনাকে অন্তরাল করিবার জন্য জলে ডুব দিল। কিন্তু মঘ বিবেচনা করিল, ঐ মহিলা বুঝি জল নিমগ্ন হইয়াছে। তখন সে দয়ার্দ্রচিত্তে জলে নামিয়া উহাকে তীরে উঠাইয়া লইয়া আসিল। এই ব্যাপারে পরিণামে ঐ স্ত্রীলোকটি তাহার আত্মীয় স্বজনগণের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল এবং সাধারণে তাহাদিগকে জাতিভ্রষ্ট বলিয়া বিবেচনা করিতে লাগিল। বাস্তবিক তৎকালে মঘেরা যে সকল অসভ্যোচিত উৎপাত করিয়া সমুদ্রতীরটাকে ছারখার করিয়া ফেলিয়াছিল, তাহাতে তাহাদের শত শত সাধুতা তাহার একাংশও পূরণ করিতে সমর্থ হয় নাই।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, সাহাবাজ খাঁর প্রতি প্রথমতঃ এই আততায়ী দস্যু-দলের দমন করিবার ভার অর্পিত হয়। সাহাবাজ খাঁ উহাদিগকে একরূপ দেশবিতাড়িত করেন। তখন আর সাহাবাজপুরে সৈন্য রাখা নিষ্প্রয়োজন বিবেচনায়, বঙ্গীয় ভৌমিকগণের উপর দস্যুদলনের ভারার্পণ করিয়া সম্রাট সাহাবাজকে রাজধানীতে থাকিতে আদেশ করেন। সে সময়ে দক্ষিণ ও পূর্ব্ব দিকে বাক্‌লা ও বিক্রমপুরে, দুইটি প্রসিদ্ধ রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত ছিল।

কুক্ষণে বারভূঞা দলের সহিত বাদসাহ জাহাঙ্গীরের মনোমালিন্য সংঘটিত হয়। তাহারা সম্রাটের অবাধ্য হওয়ায় রাজা মানসিংহ আসিয়া তাহাদিগকে উৎসাদিত করেন। এই সুযোগে মঘ ও পর্ত্তুগীজেরা প্রশ্রয় পাইয়া পুনরায় সমুদ্রতীরে উৎপাত আরম্ভ করে। তখন পুনরায় আজিম ওসমানের প্রতি ঐ সকল দস্যুদলনের ভার অর্পিত হয়। আজিম ওসমান মঘদিগকে বিতাড়িত করেন এবং কতকগুলি পর্ত্তুগীজকে ধৃত করিয়া চট্টগ্রামে ও ঢাকার নিকটবর্ত্তী মুন্সিগঞ্জ উপবিভাগের অন্তর্গত একটী স্থানে অবরুদ্ধ করিয়া রাখেন। এই স্থানটি অধুনা "ফিরিঙ্গি বাজার" নামে পরিচিত। আজিও তথায় সেই সকল পর্ত্তুগীজদিগের বংশধরেরা বাস করিতেছে।

তৎপর হইতে ক্রমে একজন প্রধান সেনাপতির অধীনতায় কতকগুলি বাদসাহী সৈন্য মেঘনা নদীর মোহানায় নিয়ত অবস্থান করিয়া, মঘ ও পর্ত্তু-গীজদিগের উৎপাত নিবারণ করিত। যখন ঔরংজেব বাদসাহ ভারতবর্ষের প্রায় একচ্ছত্র রাজা বলিয়া পরিচিত হন, তখন এই দস্যুদমনের ভার, হিন্দু-

সেনাপতি সংগ্রাম সাহের উপর অর্পিত হয়। বাদসাহ কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া সংগ্রাম সাহাবাজপুরে আগমন করেন। তখন তথায় এমন কোন দুর্গ ছিল না, যাহাতে নিরাপদে সৈন্য রক্ষা করিতে পারা যায়। এইজন্য সংগ্রাম তথায় একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করেন, প্রায় সার্দ্ধ দ্বিশত বৎসর পর্য্যন্ত লোকে তাহাকে "সংগ্রামের কেল্লা" বলিয়া নির্দ্দেশ করিত। আলমগীর-নামাতে এই দুর্গের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। ১৬৬৫ খ্রীঃ অব্দে উহা নির্ম্মিত হয়। "কলিকাতা রিভিউর ৫৩ ভল্যুমের ৭৩ পৃষ্ঠায় 'চট্টগ্রামের ফিরিঙ্গি' শীর্ষক প্রস্তাবে এই দুর্গ এবং সংগ্রামের প্রতিষ্ঠিত আরও দুইটী দুর্গের পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। মিঃ বিভারেজ তাঁহার বাখরগঞ্জের ইতিহাসের ৪২ পৃষ্ঠায় এই কেল্লা সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল।

"প্রফেসার ব্লক্ ডিক্‌লন এবং বাল্লার কৃত একখানা ক্ষুদ্র ম্যাপ আছে, তাহা (১৭২৪—২৬ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত) ফ্রাঙ্কনবেলটাইন্ কৃত পুস্তকে সংযোজিত হইয়াছে। তাহাতে দেখা যায়, বাকলা একটা দ্বীপ মাত্র ছিল। সংক্রাণের অন্তরীপ বলিয়া একটা চিহ্ন ঐ ম্যাপে দৃষ্ট হইত। ঐ চিহ্নিত স্থান দেখিলে অনুমিত হয়, মেহেন্দিগঞ্জের থানায় একটী প্রাচীন মোগলদুর্গ ছিল, তাহাকে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।"

আমরা সাহেবের এ কথায় সম্পূর্ণ অনুমোদন করি; কারণ সাহাবাজপুরবাসী অনেক প্রাচীন লোকের নিকট শ্রুত আছি, ঐ পরগণার অন্তর্গত গাঙ্কিয়া গ্রামের অনতিদূরে ইলিসা নদীর তীরে সংগ্রামের কেল্লা বর্ত্তমান ছিল। এই স্থানটী মেহেন্দিগঞ্জ থানার অন্তর্গত। পঞ্চসনার বন্দোবস্তের * কালেক্‌টরির কাগজ পত্রে সাহাবাজপুর পরগণার অন্তর্গত গাঙ্কিয়া গ্রামের যে সীমানির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তাহাতে সংগ্রামের গড়ের উল্লেখ দৃষ্ট হয় † এই কারণে সংক্রাণের অন্তরীপ ও সংগ্রামের কেল্লা যে একই স্থান, তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ বোধ হয় না। অর্দ্ধশতাব্দী অতীত হয় নাই, এই প্রাচীন মোগলদুর্গ মেঘনার শাখা ইলিসা নদীর গর্ভস্থ হইয়া, সংগ্রামের নামের একরূপ বিলোপসাধন করিয়াছে।

---

* ওয়ারেণ হেষ্টিংসের সময় জমিদারগণের সহিত প্রথম জমিদারি পাঁচসন মিয়াদে বন্দোবস্ত হয়, তাহাকে পঞ্চসনা বলে পরে দশ বৎসরের জন্য দশসনা বন্দোবস্ত হয়।

† জেলা বাখরগঞ্জের কালেক্টরীর তৌজিভুক্ত ২৭৫০ নং তালুক দুর্গাপ্রসাদ সেনের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ১২০৩ সনের বৌজা ওয়াশি দেখ।

বাকরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত ঝালকাঠি থানার অধীন রামনগর গাবখান প্রভৃতি স্থানের মধ্য দিয়া সংগ্রামনীলের খাল বলিয়া একটা দোনের পরিচয় পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ উহা সংগ্রামসাহ কর্ত্তৃক নিখাত হইয়াছিল। এইজন্য তাহার নামের সহিত ঐ খালের নাম সংযোজিত হইয়াছে। ইহাতে আরও বোধ হয়, সংগ্রাম সাহ একটা উপাধি মাত্র ছিল। নীল শব্দের সহিত অন্য কোনও শব্দ যুক্ত থাকিয়া তাহার নামকে পূর্ণাবয়ব করিত; যেমন নীলকণ্ঠ বা নীলচন্দ্র প্রভৃতি। পূর্ব্বাপর যেমন অনেকের উপাধিতেই পরিচয় পর্য্যবসিত হইয়াছে, নাম কেহ ততটা পরিজ্ঞাত নহেন, তদ্রূপ সংগ্রাম সাহ এই উপাধিতেই তিনি পরিচিত ছিলেন, তাঁহার সম্পূর্ণনাম লইবার আবশ্যকতা হয় নাই; কাজেই নামটী একরূপ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

দস্যুদলের অপসারণ করিবার জন্য সংগ্রাম নানা স্থানে গড়বন্দী করিয়া, সৈন্য রক্ষার উপায় করিয়া লইলেন। পরে মব ও পর্ত্তুগীজদিগের প্রতিকূলে সৈন্যপরিচালনাপূর্ব্বক তিনি তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়া বঙ্গদেশ হইতে দূরীভূত করিয়া দেন। এই সময়ে চাঁদরায় নামে বৈশ্যবংশীয় অপর এক মহাত্মা সংগ্রামের প্রধান সহকারী ছিলেন। সংগ্রাম তাঁহার দ্বারা নানা বিষয়ে সহায়তা প্রাপ্ত হন। সে যাহা হউক, এই সকল শত্রুদমনের কথা অচিরে সম্রাট্ ঔরংজেবের নিকট পৌছিলে, তিনি সন্তুষ্ট হইয়া সংগ্রামকে পুরস্কারস্বরূপ ভূষণা, মামুদপুর ও চাঁদরায়কে সাহাবাজপুর প.. .রে জমিদারী প্রদান করেন।

বঙ্গদেশের দ্বাদশ জন ভৌমিকের মধ্যে যাঁহারা রাজা মানসিংহের বঙ্গে আগমনের পরে ও বাদসাহের বশ্যতা স্বীকার করিলেন না, তাঁহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধসজ্জা হইয়াছিল। যশোহরের প্রতাপাদিত্য, ভূষণার মুকুন্দরায়, বিক্রমপুরের কেদার রায়, চাঁদপ্রতাপের চাঁদগাজি কোন মতে বাদসাহকে কর দিতে স্বীকৃত হইলেন না। অনেক ষড়যন্ত্রে ভবানন্দ মজুমদার ও শ্রীমন্ত খাঁ প্রভৃতি কতিপয় কূটবুদ্ধি বাঙ্গালি ব্রাহ্মণের সহায়তায় মানসিংহ এই সকল বিদ্রোহীদিগকে দমন করিতে সমর্থ হইলেন। তখন বিদ্রোহী রাজন্যগণের রাজ্য কতক সম্রাটের সরকারে খাস রাখা হইল, এবং উহার কতক অন্য জমিদারের হস্তে ন্যস্ত হইল। খাস অর্থাৎ বাজেয়াপ্ত মহাল হইতে জলযুদ্ধ ও নৌপোতের ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য নাওয়া মহাল সামিল করিয়া রাখা হইল। মুকুন্দরায়ের ভূষণা মামুদপুর এইরূপ নাওয়া মহালের অন্তর্গত রহিয়া ছিল।

ঔরংজেব এই খাস নাওয়া ভূষণা মামুদপুর, পুরস্কারস্বরূপ সংগ্রামকে প্রদান করিলেন, সংগ্রাম তথায় এক প্রকাণ্ড বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া বাসস্থান নির্ম্মাণ করেন। আমরা অতঃপর সংগ্রামের পারিবারিক ও জাতীয়-মর্য্যাদা সম্বন্ধে কতকগুলি কথার অবতারণা করিয়া তৎপরে তাঁহার প্রধানতম বীরত্বের ও সম্মানের বিষয় বিবৃত করিতে প্রয়াস পাইব।

আমাদের দেশে এইরূপ প্রবাদ চলিয়া আসিয়াছে যে, সংগ্রাম বঙ্গদেশে আগমন করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ব্রাহ্মণের নিম্নেই এদেশে কোন জাতি শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হয়? তদুত্তরে নাকি এইরূপ জানিতে পান যে "বৈদ্য জাতিই ব্রাহ্মণের পরবর্ত্তী শ্রেষ্ঠ জাতি"। তখন তিনি আপনাকে "হাম বৈদ্য" বলিয়া পরিচিত করেন।

সংগ্রাম বাণীবহগ্রামবাসী শক্তিমাধব বংশীয় সদাশিব সেনের কন্যার পাণি গ্রহণ করেন * এবং তৎপুত্র রাধাকান্ত, ধন্বন্তরি আদিত্যবংশীয় কাশীনাথ সেনের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন তাঁহার ছয়টী কন্যা ক্রমে ধন্বন্তরি উচলি বিশ্বনাথ সেনের সহিত ও উচলি রঘুনাথ সেনের সহিত ও আদিত্য রঘুনাথ সেনের সহিত ও বিকর্ত্তন রামচন্দ্রের সহিত ও শক্তিগণবংশীয় দুর্গাদাস সেনের সহিত ও আত্রেয়গোত্রীয় রঘুনাথ মজুমদারের সহিত পরিণীতা হয়। তন্মধ্যে মহামহোপাধ্যায় ভরত মল্লিক শেষটীর মাত্র উল্লেখ করিয়াছেন †। অপর কয়েকটী সম্বন্ধের বিষয় রামকান্ত কবিকণ্ঠহারকৃত কুলপঞ্জিকায় স্পষ্ট উল্লেখ আছে। সংগ্রাম সাহ কেবল অর্থব্যয়ে কার্য্য সুসিদ্ধ করিতে না পারিয়া অনেক স্থলে বলপ্রয়োগ করিতেও পশ্চাৎপদ হন নাই। ধন্বন্তরি উচলিবংশীয় বিজয় সেনের অধস্তন চতুর্থ স্থানীয় রামচন্দ্র সেন বঙ্গীয় বৈদ্যসমাজের সমাজপতি পদে বরিত ছিলেন। অবশ্য তাঁহার ধনবল ও কুলকার্য্য পরায়ণতা না

* সদাশিবের পুত্র গোপীরমণ সেন তৎপুত্র মাধব রায় ও জগদানন্দ রায়। ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত কৌয়ারপুর গ্রামে মাধবের বংশ এবং বাণীবহ গ্রামে জগদানন্দের বংশ বাস করিতেছে। কণ্ঠহার কৃত কুলপঞ্জিকা। ৪০ পৃষ্ঠা দেখ।

† রঘুনাথ মজুমদার রতিনাথ বিধানকৌ।
চত্বারো রঘুনাথস্য তনয়াঃ বিমলাবিতাঃ।
রামকৃষ্ণো রামচন্দ্র রমাকান্তস্তৃতীয়কঃ।
গঙ্গারামোঽনুজঃ সর্ব্বে মজুমদার ইতিশ্রুতাঃ
ভূষণা রাজসংগ্রাম সাহাখ্যকন্যকোদ্ভবাঃ।
চন্দ্রপ্রভা ৩৪৯ পৃষ্ঠা।

মোগল রাজবংশ মধ্যে ঔরংজেব যত দীর্ঘকাল শাসনদণ্ড পরিচালনা করেন, সেরূপ আর কেহই পারেন নাই। এই সম্রাটের অধীনে থাকিয়া যে একই সংগ্রাম বিভিন্ন স্থানে নানা কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে আর কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না সম্রাট মধ্য-বাঙ্গালার ভূষণা মামুদপুর প্রভৃতি স্থান তাঁহাকে জায়গীর অর্পণ করেন এবং কালিয়াতেও তাঁহার একটা জায়গীর ছিল, যাহা আজিও 'নাওরা' বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে।

ভূষণা পরগণার অন্তর্গত মথুরাপুর নামক স্থানে তাঁহার প্রকাণ্ড বাড়ী বর্ত্তমান ছিল। এই স্থানটী অধুনা ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত কোঁড়কদি ও মধুখালি স্থানদ্বয়ের সন্নিকটে অবস্থিত। কোঁড়কদির মাননীয় ভট্টাচার্য্য বংশের পূর্ব্বপুরুষ তাঁহার গুরু ছিলেন। অদ্যাপি তৎপ্রদত্ত কতিপয় ভূবৃত্তির লিখন উক্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয়দিগের নিকট বর্ত্তমান আছে। মথুরাপুর গ্রামে আজিও একটা প্রকাণ্ড মঠ দৃষ্ট হয়, যাহাকে সাধারণে সংগ্রামের দেউল বলিয়া থাকে। সংগ্রাম সাহের সভায় শ্রীকান্ত বেদাচার্য্য নামে এক জ্যোতির্ব্বিদ ছিলেন। তিনি গণনা করিয়া পর দিবস সংগ্রামের মৃত্যু হইবে, এই কথা প্রকাশ করায় তাঁহার সম্পত্তি খাস করা হয়। কেহ কেহ অনুমান করেন, ১৬৪২ খৃষ্টাব্দে সংগ্রামের মৃত্যু হয়, তাহা যে সত্য নয়, আলমগীর নামা—কথিত কেল্লা স্থাপনেই উহা প্রতিপন্ন হইবে। সংগ্রামের পুত্রের পরলোক গমনের পর সীতারাম রায়ের পিতা উদয়নারায়ণ ভূষণার সাজোয়াল হইয়া আইসেন।

বিখ্যাতনামা রাণী ভবানীর সময়ে ভূষণাবাসী কোন ব্রাহ্মণের বৃত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়। তখন ঐ ব্রাহ্মণ রাণীর নিকট যে আবেদন পত্র প্রেরণ করেন, তাহাতে ভূষণার পূর্ব্বস্বামী সংগ্রাম ও সীতারাম রায়ের নাম স্পষ্ট উল্লেখ আছে। আমরা প্রয়োজন বোধে ঐ আবেদন পত্র হইতে একটী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—

"পূর্ব্বৈঃ সংগ্রাম সাহা নৃপতি প্রভৃতিভিঃ পালিতা ভূষণা যা,
সীতারামেণ পশ্চাত্তদনু রসবতী রামকান্তেন চোঢ়া*
সা চেদানীং সপত্নীকরযুগলগতা স্বামিহীনা বিরূপা,
কেষাং বা নাস্থগাসৌ নচ ভবতি কথং কেন বা নাস্থয়য়া।

---

* রাণী ভবানী নাটোররাজ রামকান্তের সহধর্ম্মিণী ছিলেন। রামকান্তই ভূষণাধিপতি ছিলেন। তদনন্তর রাণী ভবানীর হস্তগত হয়, এইজন্য কবি ভূষণাকে "সপত্নী-করযুগলগতা" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

যশোহর কালেক্টরীর ১২০৯ সালের ১৭০৬ নং তায়দাদ দৃষ্টে অবগত হওয়া যায়, নলদী পরগণার অন্তর্গত ভাঁটুদহ গ্রামে ১০৩১ সালে ১৯ আকবর (১৬২৬ খ্রীঃ অব্দে) রামভদ্র ন্যায়লঙ্কারকে এবং ১৯৩৩ নং তায়দাদ ১০৪৯ সনের পৌষ মাসে ১৭৪১ খ্রীঃ অব্দে জানুয়ারী মাসে রামতনু ভট্টাচার্য্যকে সংগ্রামসাহ ব্রহ্মত্র জমি দান করেন।

সীতারাম রায়।

সীতারামের প্রপিতামহ রাম রামদাস রাজমহলের নবাব সরকারের খাস সেরেস্তায় কোন রাজ পদে বিচক্ষণতার সহিত কার্য্য করিয়া বিশ্বাস খাস উপাধি ধারণ করেন। তৎপুত্র হরিশ্চন্দ্র ঐ স্থানের একটী উচ্চ রাজপদ লাভ করিয়াছিলেন। হরিশ্চন্দ্রের পুত্র উদয় নারায়ণ, প্রথম পিতৃপদে, পরে নবাব ইব্রাহীম খাঁর অধীনে ঢাকার রাজ কার্য্যে নিযুক্ত হন। সংগ্রামের বংশধরগণ হইতে ফতেয়াবাদ চাকলা নবাব সরকারে খাস হইলে পর উদয় নারায়ণ বন্দোবস্ত জন্য এই স্থানে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

ঔরংজেব বাদসাহের রাজত্ব সময়ে ইব্রাহীম খাঁ বঙ্গদেশের শাসন কার্য্যে নিযুক্ত হন। (১৬৮৯—১৬৯৭ খ্রীষ্টাব্দে) এই সময়ে পশ্চিম বঙ্গে সভাসিংহও রহিম খাঁ বিদ্রোহী হইয়া বর্দ্ধমান প্রভৃতি স্থান লুঠ করিয়া উৎসন্ন প্রায় করে। ঠিক ঐ সময়ে ভুষণা মহম্মদপুরের কায়স্থ বংশীয় সীতারাম রায় অভ্যুদয় লাভ করেন। সংগ্রামের কোন বংশধর না থাকায় রাজস্ব আদায় জন্য যৎকালে ভূষণায় বন্দোবস্ত আরম্ভ হয়, তৎ সময়ে সীতারাম আরও কতকগুলি স্থান বন্দোবস্ত করিয়া লন, পরে নবাব ইব্রাহীম খাঁকে দুর্ব্বল বিবেচনা করিয়া, স্বয়ং স্বাধীনতা অবলম্বন করিবার চেষ্টা পান। এই সময় ভূষণা নলদী ও তন্নিকটবর্ত্তী পরগণাগুলি তাঁহার হস্তগত হয়। ইব্রাহীমকে অকর্ম্মণ্য বিবেচনা করিয়া বাদসাহ তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া তৎপদে ক্রমে আজিম ওসমান ও তৎপরে মুর্শিদকুলী খাঁকে নিযুক্ত করেন।

মুর্শিদকুলীর সময়ে সীতারাম ক্রমেই গর্ব্বিতভাব ধারণ করেন। পরে একবারে বিদ্রোহ হইয়া দাঁড়ান, তখন নবাব আবুতোরাপনামক বাদসাহের নিকট সম্পর্কিত সেনাপতিকে সীতারাম রায়ের দমন জন্য প্রেরণ করেন। আবুতোরাপের সহিত সীতারামের যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে তিনি নিহত হন। সীতারাম পূর্ব্বে জানিতে পারেন নাই, আবুতোরাপ বাদসাহের নিকট সম্প-

র্কিত লোক। পরে জানিতে পারিয়াও আবুতোরাপের শৌর্য্য বীর্য্য দর্শনে মুগ্ধ হইয়া বিশেষ অনুতাপ বোধ করেন।

এদিকে মুর্শিদকুলী জানিতে পারিলেন, আবুতোরাপ যুদ্ধে হত হইয়াছে। তখন তাহার বিশেষ ভাবনার বিষয় হইল, কারণ আবুবাদসাহের স্বসম্পর্কিত লোক। যাহা হউক, কালবিলম্ব না করিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ আপন শালীপতি-ভ্রাতা বক্স আলিকেও পরামর্শ প্রদান জন্ম রঘুনন্দনকে ভূষণায় প্রেরণ করিলেন।

সীতারামের সেনাপতি মেনাহাতী এক দিন অতি প্রত্যুষে বিপক্ষের গতিবিধি অবগত জন্ম যেমন ছদ্ম বেশে বাহির হইয়াছেন, অমনি নবাব সৈন্যগণ তাহা বুঝিতে পারিয়া বেষ্টন করতঃ পিঞ্জরাবদ্ধ ব্যাঘ্রবৎ নানাদিক হইতে অস্ত্র প্রহারে হত করিয়া ফেলে। অতঃপর সীতারাম রায়ের সহিত তাহাদের আরও কয়েকবার যুদ্ধ হয়, কিন্তু পরিণামে সীতারাম রায় পরাস্ত হইয়া বন্দীদশায় মুর্শিদাবাদ প্রেরিত হন। তথায় বন্দী অবস্থায় তাঁহার প্রাণনাশ হয়। (১৭১৪ খ্রীষ্টাব্দে)।

নবাবী আমলের জমিদারী খাস হইলে যেরূপ ব্যবহার হইয়া থাকিত, এ স্থলেও তাহাই হইল। ভূষণার জমিদারী নিম্নলিখিত মত বাটোয়ারা হইয়া গেল।

১। রঘুনন্দন স্বীয় ভ্রাতা রামজীবনের নামে নলদী বিভাগে ভূষণা চাকলায় আমিরাবাদ, আরঙ্গাবাদ, বাজুবস্ত, মামুদসাহী, নলদী, তেলীহাটী, নসরৎসাহী বেরদিয়া, কাসীম নগর প্রভৃতি ইহা ১৩০ পরগণায় বিভক্ত এবং রাজস্ব ১৬৯৬০৮৭ টাকা নির্দ্দিষ্ট হয়। নাটোর জমিদারীর ইহাই প্রধান অংশ।

২। কৃষ্ণনগরের রাজবংশ, ভূষণার অন্তর্গত হলদা, চণ্ডিয়া, জগন্নাথপুর, প্রভৃতি চাকলা উহা ৭৩ পরগণায় ৫৯৪৮৪৩ টাকা জমা ধার্য্য হয়।

৩। বজাধিকারীগণের ভূষণা চাকলায়, জাহাঙ্গীরাবাদ, পাইগা, বাজুবস্ত প্রভৃতি ছিল।

৪। মামুদসাহী জমিদারী, ভূষণা চাকলা মধ্যে অবস্থিত ছিল। উহার কতকাংশ নলডাঙ্গার রাজাদের সহিত বন্দোবস্ত হয়। এতৎসহ আরঙ্গাবাদ বাজুবাল জাহাঙ্গীরাবাদ মামুদসাহী ও তাড়াভাঙ্গা প্রভৃতি কতকাংশ ছিল।

চাকলে জাহাঙ্গীর নগর পরগণে জালালপুর।

প্রাচীন ফতেয়াবাদের অন্তর্গত একটী মহাল। উহার অপর নাম সোয়াখাল। খিলিজি বংশীয় জালালউদ্দীন সাহের নামানুসারে উহার জালালপুর

নামকরণ হয়। টোডর মল্লের বন্দোবস্ত সময়ে, উহার রাজস্ব ছিল, ১৮৫৭২৩০ দাম। নবাব সুজা উদ্দীনের বন্দোবস্ত মতে ১৭২৮ খ্রীঃ অব্দে উহার কর ধার্য্য ১১০৩৩৫ টাকা হয়। তৎপর নবাব কাশীম আলি খাঁর বন্দোবস্ত মতে ১৭৬৩ খ্রীঃঅব্দে উহার খাজনা বৃদ্ধি হয়, ১৫৩০০৫ টাকা। সুজাউদ্দীন এবং মীরকাসেমের বন্দোবস্ত সময়ে এই পরগণার মালিক ছিলেন নুরউল্লা, কিন্তু শেষ বন্দোবস্ত সময়ে নুরউল্লা জীবিত ছিলেন না। তাঁহার শোচনীয় মৃত্যুর বিবরণ উল্লেখ করা যাইতেছে। জালালপুর অতি বৃহৎ পরগণা। এই পরগণা ভূষণার পূর্ব্ব হইতে পদ্মার পশ্চিম পর্য্যন্ত প্রসারিত। বর্ত্তমান ফরিদপুর জেলা প্রথম "ঢাকা জালালপুর" জেলা নামে পরিচিত ছিল।

নুরুউল্লা।

চাকলা জাহাঙ্গীর নগরের অন্তঃর্গত সমস্ত ভূষণা, যশোহর ও ঘোড়াঘাটের কতক খাস ভূভাগ লইয়া, জালালপুর ও অন্যান্য কতকগুলি ক্ষুদ্র জমিদারীর সৃষ্টি হয়। তন্মধ্যে জালালপুর সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ বলিয়া জানা যায়। নবাব নাজেম মুর্শিদকুলী জাফর খাঁর জামাতা সুজাউদ্দীন, তৎ জামাতা মুর্শিদ কুলী খাঁ এই সময়ে শ্বশুরের প্রতিনিধি স্বরূপ ঢাকার শাসন কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন: মীর হবীব নামে তাঁহার এক অমাত্য ছিল, এই ব্যক্তি প্রথমাবস্থায়, হুগলিতে দালালের কার্য্য করিত, পরে ঢাকার মুর্শিদকুলী খাঁর অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার প্রধান অমাত্য পদে বিরত হন।

হবীর অতি ক্রুর প্রকৃতির লোক ছিলেন, বিশেষ ঢাকার সর্ব্ব প্রধান ধনী ও জমিদার আগাবাকের সহিত সখ্য থাকায়, তিনি আর কাহাকেও গ্রাহ্য করিয়া চলিতেন না। যদি জানিতে পারিতেন, কাহারও ধন সম্পত্তি আছে, তবেই অছিলা করিয়া তাহাকে কয়েদ করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইতেন। বিশেষ শাসন কর্ত্তার প্রিয়পাত্র হওয়ায় ও স্বীয় প্রভু নবাবের জামাতার জামাতা হওয়ায় তাহার সাহস অত্যধিক রূপে বাড়িয়া গিয়াছিল।

এই সময়ে জালালপুরের জমিদার নুরুউল্লার যথেষ্ট সম্পত্তি আছে বলিয়া প্রচারিত ছিল। হবীবের উৎক্রোশ দৃষ্টি তদুপরি নিপতিত হইল। কতক বার ছল করিয়া তাঁহার নিকট হইতে বহু অর্থ সংগ্রহ করা হয়, পরে যখন আবার তাঁহাকে অন্যায়মত চাপিয়া ধরা হয়, তখন নুরুউল্লা একেবারে উহা অগ্রাহ্য করিয়া এক কপর্দ্দক দিতেও স্বীকৃত হন না।

হবীব তখন স্বীয় প্রভু মুর্শিদকুলি খাঁকে জানাইলেন,জালালপুরের জমিদার বিদ্রোহী হইয়াছে। যেমন জানান, তৎক্ষণাৎ তাহারুদ্ধে সেনা সজ্জিত হইয়া জালালপুরের দিকে অগ্রসর হইল। সুরুউল্লাও তখন মরি বাঁচি বলিয়া বাধা প্রদান করিতে অগ্রসর হইলেন। উভয় পক্ষের যুদ্ধে বহু সৈন্যের পতন হইয়া পদ্মার স্বচ্ছ সলিল রক্তিমাকার হইয়া উঠিল। পরিণামে কিন্তু সুরুউল্লা ধৃত হইয়া ঢাকাতে নীত হন। পরে তথায় সেই শৌর্য্যশালী ও নিরপরাধ জমিদারের প্রাণদণ্ড বিধান হয়।

তাঁহার বহু সম্পত্তি ও ধনরত্ন বাজেয়াপ্ত করা হইলে ধনরত্ন কতক মুর্শিদাবাদে নবাব নাজিম নিকট ও অধিকাংশ হবীবেরও তৎ প্রভু মুর্শিদের ধনাগারে প্রেরিত হয়। সুরুউল্লার পাটপাশার পরগণা হবীব মিত্র আগাবাকেরের পুত্র জাদিককে দান করেন * এই মীর হবীবের নামানুসারেই বরিশাল ও ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত পরগণে হবীবপুরের নামকরণ হয়। হবীবের সহকারী সোমকোটবাসী বৈদ্য দেওয়ান নিধিরাম দাস পরে এই পরগণা হস্তগত করেন। বিক্রমপুরের ন্যায় এই পরগণার ও কোন জমিদার বর্ত্তমান সময়ে দৃষ্ট হয় না। গবর্ণমেণ্টের অধীনে বহু তালুকদার এইপরগণা ভোগ করিতেছে।

চাকলা বিভাগ।

আকবর বাদসাহের রাজত্ব কালে মহাত্মা টোডরমল্ল কর্ত্তৃক বঙ্গদেশ ৩৩টী সরকারে বিভক্ত হইয়া রাজস্ব আদায়ের কার্য্য চলিতে থাকে। উহার পর ঔরঙ্গজেব বাদসাহের সময়ে মুর্শিদকুলী খাঁ যখন বাঙ্গালার শাসন কার্য্য আরম্ভ করেন, তৎকালে ঐ চাকলার পরিবর্তে বঙ্গদেশকে ২৭টী সরকারে বিভক্ত করিয়া রাজস্ব আদায়ের সুবিধা করিয়া লন। তন্মধ্যে চাকলে জাহাঙ্গির নগর (ঢাকা) ও চাকলে ভূষণার কতকাংশ লইয়া বর্ত্তমান ফরিদপুর জেলার সংগঠন হইয়াছে। এই চাকলা বিভাগ সময়ে ভূষণার সীতারাম একজন প্রবল প্রতাপশালী জমিদার ছিলেন, তাঁহার সহিত ফরিদপুর ইতিহাসের সম্বন্ধ ততটা অধিক নয়। তথাপি সংক্ষেপে তৎ সম্বন্ধীয় বিবরণ পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। এক্ষণ ভূষণা ও জাহাঙ্গির নগর চাকলা হইতে কোন স্থান ফরিদপুরের এলেকাভুক্ত হইয়াছে, তাহা আমরা মহাত্মা রেণোলের ম্যাপ হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

---

* Riaz, Text—As soc. Edition, P. 300.

রেনেলের ম্যাপের পরিচয় স্থান।

রেনেল সাহেবের নাম ইতিহাসজ্ঞ এবং ভূগোল ব্যবসায়ী ব্যক্তিমাত্রেই, পরিজ্ঞাত আছেন। তৎকৃত ম্যাপের পরিচয় অনেকের নিকট শুনা যায়, কিন্তু তৎকৃত সংগ্রহ সকল অধিক লোকের নয়নপথের বশবর্ত্তী হইয়াছে বলিয়া বিশ্বাস হয় না। অনেকে কোন কোন ইংরাজ অথবা বাঙ্গালীর লিখিত নোট দেখিয়া তদবলম্বনে তাঁহার নাম লইয়া থাকেন। সৌভাগ্যক্রমে, আমাদের উহা দর্শনের সম্যক সুবিধা ঘটিয়াছিল, সেইহেতু এসম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করিতে প্রয়াস পাইলাম।

রেনেলের পদবীসহ নাম—জেমস্ রেনেল, এফ, আর, এস্। এই মহাত্মা বঙ্গদেশের সার্ভেয়ারজেনেরেল এবং ইঞ্জিনিয়ার শ্রেণীতে উন্নীত হইয়াছিলেন। ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধিকার সময়ে, কোর্ট অব ডাইরেক্টরগণের অনুমত্যানুসারে তৎকর্ত্তৃক সমগ্র বঙ্গ বিহার ও এলাহাবাদের মানচিত্র অঙ্কিত ও মুদ্রিত হয়।

ইংরাজাধিকারের প্রথম সময়ে, বঙ্গ বিহার আট ভাগে বিভক্ত হয়, যথা—(১) হুগলী (২) মুর্শিদাবাদ (৩) পাটনা (৪) দ্বারভাঙ্গা, মুঙ্গের, বাল্লীয়া, ছাপরা (৫) মালদহ (৬) ঢাকা (৭) মেদিনীপুর (৮) পালামো ও সিংহভূম প্রভৃতি। এই আটটী বিভাগে, একবিংশতি খানা মানচিত্র অঙ্কিত হয়।

আমরা এস্থলে দ্বাদশ ও সপ্তদশ সংখ্যক ম্যাপের কোন কোন বিষয় অবলম্বন করিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধ লিখিতে প্রয়াস পাইলাম। (১) বঙ্গদেশের প্রাচীন মানচিত্র পরিদর্শন করিলে স্পষ্ট প্রতীতি হয়, যে খাস বাঙ্গালা প্রধানতঃ নৈসর্গিক কারণে, দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। বর্ত্তমান সময়ে যদিও প্রায় ঐরূপই পরিদৃষ্ট হয়, তথাপি উহার অনেক স্থান ও নদী নালার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। এস্থলে যে দুইটী ভাগের কথা উল্লেখ করা হইল, উহার এক ভাগ, পশ্চিমে হুগলী নদী হইতে আরম্ভ হইয়া পূর্ব্বদিকে গঙ্গা বা পদ্মা নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। উহার উত্তরে বেতরিয়া; দক্ষিণে, বঙ্গোপসাগর। অপর ভূভাগ, পশ্চিমে পদ্মা হইতে আরম্ভ হইয়া, পূর্ব্বদিকে ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা নদীর পশ্চিম তট পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। উহার উত্তরাংশ পর্ব্বতময় ও জঙ্গলাকীর্ণ ব্রহ্মপুত্র-নদের তটবর্ত্তী স্থান-নিচয়; দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর; এই ভূভাগই গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের মধ্যস্থ "ব" দ্বীপনামে পরিচিত।

(১) ১৭৮০ ও ১৭৮১ সনে এই ম্যাপ দুই খানা মুদ্রিত হয়। বাঙ্গালাদেশ আকবর বাদসাহের সময়ে ১৯টী সরকারে বিভক্ত হইয়া পরে মুর্শিদকুলী খাঁ দ্বারা তৎপরিবর্ত্তে চাকলায় পরিবর্ত্তিত হয়। ৮০ পৃষ্ঠায় ভ্রম ক্রমে ২১ সরকারে বিভক্ত লেখা হইয়াছে।

ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানীর রাজ্যশাসন সময়ে প্রথম বিভাগে—

(১) রাজসাহী পরগণা (২) চুনাখালী (৩) সাজন (৪) জাহানাবাদ (৫) কৃষ্ণনগর (৬) হুগলী (৭) যশোহর (৮) ভূষ্ণা (৯) মহম্মদসাহী (১০) সুন্দরবন; এবং দ্বিতীয় বিভাগে ১ম—প্যাটপাসার, ২য়—ঢাকা, ৩য়—আটীয়া, ৪র্থ—পুখরিয়া, ৫ম—কাগমাইর, ৬ষ্ঠ—আমিরাবাদ এই কয়েকটী স্থান পরিলক্ষিত হইত। এতভিন্ন ত্রিপুরা ও চট্টগ্রাম স্বতন্ত্র দুইটী স্থান, মেঘনানদের পুর্ব্বতটে কোগইর নদীর আয়ত্তাধীন হইয়াছিল।

তৎসময় জাহাঙ্গীর নগর বা ঢাকা চাকলা বলিতে, উত্তরে—করুই বাড়ী, গোনাসার পাহাড় ও শ্রীহট্ট, পূর্ব্বদিকে—মেঘনার পূর্ব্বতটবর্ত্তী ভুলুয়া, লক্ষীপুরা ও জুগদীয়ার পূর্ব্ব। পশ্চিমে—পুখরিয়া ও আবীয়ার পশ্চিম্ এবং ভুষণা, দক্ষিণে—বঙ্গোপসাগর। বর্ত্তমান সময়ের সমুদয় বাখরগঞ্জ বা বরিশাল জেলা ফরিদপুরের চতুর্থাংশ এবং প্রায় সমস্ত নোয়াখালী ইহার অন্তর্গত ছিল।

ভূষণার সীমা তৎসময়ে এইরূপ ছিল—উত্তরে পদ্মা ও বেতরিয়ার ক্ষুদ্রাংশ এবং কুবারসাহী, পশ্চিমে মহম্মদসাহী, নলডাঙ্গা ও যশোহর; দক্ষিণে—ঢাকার অন্তর্গত বাখরগঞ্জের অংশ বিশেষ।

ঢাকা বিভাগের সম্পূর্ণ স্থানগুলির পরিচয় দেওয়া এস্থলে সহজসাধ্য নয়। এখানে মাত্র ঢাকা হইতে বরাবর দক্ষিণাভিমুখে গঙ্গা বা পদ্মার সহিত মেঘনা সম্মিলিত হইয়া যে স্থান হইতে সমুদ্রাভিমুখে গমন করিয়াছেন, সেই ভূভাগ মধ্যে কতিপয় স্থানের নাম উল্লেখ করা যাইতেছে। তৎসময় নোয়াখালী ও ত্রিপুরার কতকাংশ ঢাকার অন্তর্গত ছিল, তাহাও পরিত্যক্ত হইল।

১ শ্যামপুর, ২ ফতুল্লা, ৩ নারায়ণগঞ্জ, ৪ ইদ্রাকপুর, (মুন্সিগঞ্জ প্রভৃতি) ৫ ফিরিঙ্গিবাজার, ৬ আবদুল্লাপুর, ৭ মীরগঞ্জ, ৮ মাকহাটী, ৯ সেরাজদী, ১০ রাজাবাড়ী, ১১ সেকেরনগর, ১২ হাসারা, ১৩ বোলঘর, ১৪ বারইখালী, ১৫ মুরপুর, ১৬ ধাউদিয়া, ১৭ বালী গাঁ, ১৮ মুনকিশোর, ১৯ চণ্ডীপুর। রেনেলের ম্যাপে ঢাকা হইতে আরম্ভ করিয়া এই স্থান গুলি ধলেশ্বরী, বুড়ীগঙ্গা ও কালীগঙ্গার উত্তর তীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। যাহা অধুনা আইরলবিল নামে প্রসিদ্ধ, তৎসময় উহা চুরাইনবিল নামে পরিচিত ছিল।

কালীগঙ্গা নদীর দক্ষিণ-তটবর্ত্তী স্থান—১ মূলকৎগঞ্জ, ২ করাতীকাল, ৩ জগসা, ৪ কান্দাপাড়া, ৫ শ্যামপুর, ৬ খাঁলগাঁ, ৭ সারেঙ্গা, ৮ চিকন্দী, ৯ গঙ্গানগর, ১০ রাধানর, ১১ খাগটীয়া, ১২ সমকোট, ১৩ রাজনগর ১৪ কড়িকুল, ১৫ নবীপুর, ১৬ ফুলবাড়ী, প্রভৃতি।

মেঘনাতটে, কালীগঙ্গার দক্ষিণ—

১ বুহার, ২ স্নানঘাটা, ৩ কার্ত্তিকপুর, ৪ ডগুই, ৫ বামগাও, ৬ ভয়রা, ৭ সাদকপুর, ৮ শ্রীরামপুর, ৯ পাতলাভাঙ্গা, ১০ সিরান্দী, ১১ ছুহুলিয়া, ১২ সন্‌সদীয়া (সিলন্দীয়া), ১২ লক্ষীরদিয়া, ১৩ ঢেউখালী, ১৪ ছোটবাখরগঞ্জ, ১৫ গান্ধিয়া।

পদ্মাতটে, কালীগঙ্গার দক্ষিণে—

১ দীঘারিপাড়া, ২ রাজাখালী, ৩ ভাঙ্গাবাড়া, ৪ কলারগাঁ, ৫ বালীসার, ৬ বুদারশাপ (বদরাসন), ৭ মাছুয়াখালী, ৮ গজারিয়া, ৯ সোনাপাড়া, ১০ সনরপুর, ১১ সলুয়ারহাট, ১২ বগাও, ১৩ কুশারিয়া, ১৪ ইসলারচর, ১৫ মেন্দিগঞ্জ, ১৬ আবতুলাপুর, ১৭ সুলতানা, ১৮ কন্দর্পপুর। এই কন্দর্পপুরের নিম্নে মেঘনা ও পদ্মার সম্মিলন ঘটে।

গঙ্গা বা পদ্মার শাখা হরগঙ্গার তটবর্ত্তী স্থান—

১ ফরিদপুর, ২ পাটপাদার, ৩ হাজিগঞ্জ, ৪ চরমনরিয়া (চরমুকুন্দিয়া), ৫ আলিপুর। এই আলিপুর হইতে হরগঙ্গা বরাবর দক্ষিণাভিমুখে হাবুল্লা নাম ধারণ করিয়াছিল। তাহার তীরে,—৬ সাচারপুর, ৭ সাজাদপুর, ৮ পাটিখালী, ৯ বন্দরখলা, ১০ পাঁচ্চর, ১১ সেকপাড়া, ১২ গোপালগঞ্জ, ১৩ হরিগঞ্জ, ১৪ আলুয়াবাদ, ১৫ মাদারিপুর, ১৬ কুলপদ্বীপ, ১৭ কালকিনী, ১৮ সেলাপট্টি, ১৯ টেঙ্গরামারি, ২০ মসজীদ, ২১ রামনগর, ২২ গৌরনদী। আর বাহুল্য প্রযুক্ত উল্লেখ করা হইল না।

ভূষণা চাকলার অন্তর্গত স্থানের নাম—

১ কোবাখালী, ২ হোগলা, ৩ হাবাসপুর, ৪ কুমারখালী, ৫ বেরামপুর, ৬ সাদাপুর, ৭ গুলিশপুর, ৮ বেলগাছি, ৯ কলকাপুর, ১০ জাহাডিঙ্গা, ১১ কমলদিঘী, ১২ মজুল, ১৩ সেনপাড়া, ১৪ বেরপুর, ১৫ বালীয়াকান্দী, ১৬ নহরা ১৭ আভাসকুনারী, ১৮ গোত্রাখালী, ২০ কৃষ্ণপুর, ২১ ফরিদপুর, ২২ ছোট-চোবান, ২৩ মথুরাপুর, ২৪ কানাইপুর, ২৫ হীরাপুর, ২৬ সহরভূষণা, ২৭ গোপালপুর, ২৮ মানিকনগর, ২৯ তালমা, ৩০ হাকিমপুর, ৩১ বাবুখালী ৩২ জয়নগর, ৩৩ গড়টী, ৩৪ রাজাপুর, ৩৫ বিনটপুর, ৩৬ মহম্মদপুর, ৩৭ কামারগাঁ, ৩৮ কলনাপট্টি ৩৯ কাগাইল, ৪০ কালীনগর, ৪১ নহাট্টা, ৪২ মীরগঞ্জ, ৪৩ মুকন্দপুর, ৪৪ বাইটকামারী, ৪৫ টেঙ্গরাখালী, ৪৬ মহারাজপুর, ৪৮ দীঘলনগর, ৪৮ পুলটীয়া, ৪৯ বরিশাল, ৫০ সেকপাড়া, ৫১ কালীনগর, ৫২

গাজাটীয়া, ৫৩ বলাসী, ৫৪ কয়রা, ৫৫ মজুমপুর, ৫৬ শালথীয়া, ৫৭ খাজুরা, ৫৮ শ্রীরামপুর, ৫৯ দামনাথী, ৬০ গাণ্ডারহাটী, ৬১ রাজাপুর, ৬২ সাতরিয়া, ৬৩ ইনাইতপুর, ৬৪ আড়পাড়া, ৬৫ ঢুকালী, (ঢেউখালী) ৬৬ রাজাপুর, ৬৭ গোড়াখালী, ৬৮ রাউদপুর, ৬৯ বানসরী, ৭০ কলনা, ৭১ সামরুল, ৭২ কালনডিঙ্গা, ৭৩ শৌনপুর, ৭৪ চামারী, ৭৫ কালীয়া, ৭৬ দেয়ানশ্রী, ৭৭ গোপালগঞ্জ, ৭৮ গোবরা, ৭৯ বাবানী, ৮০ টাঙ্গিপাড়া, ৮১ ঘোড়াডাঙ্গা ৮২ শিবরামপুর, ৮৩ চাঁদপুর, ৮৪ ফলসী, ৮৫ নেজারহাট, ৮৬ খড়রিয়ার কতকাংশ বিলসমষ্টি।

অধুনা ভূষণার কতকাংশ যশোহর ও খুলনা জেলার অন্তর্গত এবং কতকাংশ ফরিদপুর জেলার অন্তর্ব্বর্ত্তী হইয়াছে। ফরিদপুর জেলার বর্ত্তমান ম্যাপ অনুসন্ধান করিয়া পরে উহা নির্দ্ধারণ করা যাইবে।

ঢাকার দক্ষিণে ধলেশ্বর নদীর দক্ষিণতট হইতে বরাবর দক্ষিণদিক অগ্রসর হইলে একমাত্র কালী গঙ্গা নামে একটী ক্ষুদ্র স্রোতস্বতীর পরিচয় পাওয়া যায়। উহা বিক্রমপুরের বক্ষোদেশে উপবীতবৎ প্রতীয়মান হইত। মেঘনা হইতে একটী পয়োনালী বাহির হইয়া, প্রথমতঃ দক্ষিণতটে মূলফৎগঞ্জ ও উত্তর তটে ফুলবাড়ীর নিকট প্রবাহিত হইয়া পরে তথা হইতে দুইটী ক্ষুদ্র শাখা বরাবর পশ্চিমাভিমুখে দুই দিকে বিস্তৃত হইয়া রাধানগরের নিকট পদ্মার সহিত সম্মিলিত হইয়াছিল। রাজনগর, সোমকোট, রাধানগর, ফুলবাড়ী প্রভৃতি স্থান উভয় নদীর মধ্যস্থলে বর্ত্তমান ছিল। দক্ষিণদিকের শাখা তটে মূলফৎগঞ্জ, নবীপুর, জপসা, লরিকুল, কান্দাপাড়া, সারেঙ্গা চিকন্দী, গঙ্গানগর এবং উত্তরদিকের শাখার উত্তর তটে চণ্ডীপুর, ঢোলসমুদ্র, ধাউড্ডা, ধানকোণা মুলগাঁ প্রভৃতি গ্রামগুলির অবস্থিতি ছিল। তৎসময় কার্ত্তিকপুর কালীগঙ্গার দক্ষিণ ভাগে মেঘনা তটে বিদ্যমান ছিল।

১৭৮১ খ্রীঃ অব্দে রেনেলের এই মানচিত্র অঙ্কিত হয়। তৎসময় পর্য্যন্ত বিক্রমপুর মধ্যে কীর্ত্তিনাশা বা ইদিলপুর মধ্যে নয়াভাঙ্গনীর উদ্ভব হয় নাই। পূর্ব্বে রাজাবাড়ী ও চণ্ডীপুর উভয় স্থান কালীগঙ্গার উত্তর দিকে ছিল; পরে যে সময় কীর্ত্তিনাশার বিস্তার হয়, তৎসময় আমরা কীর্ত্তিনাশার পূর্ব্বোত্তর পার রাজবাড়ী এবং দক্ষিণ পার চণ্ডীপুরের অবস্থান দেখিয়াছি। অধুনা চণ্ডীপুর নদীগর্ভস্থ হইয়া পুনরায় চরে পরিণত হইয়াছে।

অতঃপর কালীগঙ্গা হইতে পদ্মা ও মেঘনার সম্মিলিত স্থান কল্পর্পপুর

পর্য্যন্ত আর কোন নদীর অস্তিত্ব এই মান চত্রে বিদ্যমান নাই। পরে কিন্তু ইদিলপুর মধ্যে নয়াভাঙ্গনী এবং সাহাবাজপুর ও আবদুল্লাপুরের মধ্যে মেন্দিগঞ্জ নামে একটী নদীর প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। এই সময় হইতেই কীর্ত্তিনাশা, নয়াভাঙ্গানী, মেন্দিগঞ্জ নদীত্রয় মেঘনার সহিত পদ্মার সম্মিলন করিয়া দেয়।

ফরিদপুরের উত্তর-পূর্ব্বে পদ্মা বা গঙ্গা বিদ্যমান ছিল। অতি পূর্ব্বকালে এই নদী ফরিদপুর ও পাঠপাসারের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইত। বর্ত্তমান সময়ে পাঠপাসারের পূর্ব্বোত্তর দিক দিয়া ইহার গতি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। পাঠপাসারের নিকট হরগঙ্গা নামে একটী ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী পদ্মা হইতে বহির্গত হইয়া ক্রমে দক্ষিণাভিমুখে প্রবাহিত হইয়া ফরিদপুরের উত্তরদিকে এবং কৃষ্ণপুরের দক্ষিণে পুনরায় পদ্মার সহিত সম্মিলিত হইয়াছিল। ফরিদপুরের নিকট হইতে আবার একটী ক্ষুদ্র শাখা বাহির হইয়া আলীপুরের নিকট পুনরায় পদ্মাতে পতিত হইয়াছিল। হরগঙ্গার তাট কলসদীঘি একটি বৃহৎ বন্দর ছিল। পশ্চিমে চন্দনানদী মধীপুরের নিকট পদ্মা হইতে বাহির হইয়া কানাইপুর, গোপালপুর, কুমারগঞ্জ, কালীনগর,টেঙ্গরাখালি, দিগনগর, কবিরাজপুর,হরিগঞ্জ হইয়া মাদারিপুরের নিকট হারবিলা নদীর সহিত মিলিয়াছিল। রেনেলের পরবর্ত্তী মানচিত্রে দেখা যায়, এই হারবিলার একাংশই ভুবনেশ্বর নাম ধারণ করিয়াছে। অবশিষ্টাংশ আইরলখার মধ্যে বিল ও ভূভাগে পরিণত হইয়াছে। চন্দনার দক্ষিণাংশের নাম মধুমতী নদী, ইহার তীরে গোপালগঞ্জ, গোবরা, খড়রিয়ার বিল ও কোটালীপাড়ার বিলসমষ্টি।

বলা বাহুল্য শত বৎসরের মধ্যে পূর্ব্ববঙ্গ বিশেষতঃ ফরিদপুর ও ঢাকার মধ্যভাগে নদী কর্ত্তৃক এমন পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে যে, তাহা ভাবিতে গেলে বিস্ময়ে আপ্লুত হইতে হয়। স্থল ভাগ জলে, জল স্থলে এবং এক নদীর স্থানে অন্য আর একটা প্রাদুর্ভূত হইয়া পুরাতনকে সম্পূর্ণ নূতনে পরিণত করিয়াছে। একমাত্র মানচিত্রের সহায়তা ব্যতীত তাহা অনুমানে নির্ণয় করা কাহারও পক্ষে সহজসাধ্য নয়।

গেরদার প্রস্তর লিপি।

কস্‌বে মিরচ নামক পুরাতন দলিলে (কাগজে) গেরদার নাম উল্লেখ আছে। গেরদা ফরিদপুর সহরের ৪।৫ মাইল দক্ষিণ পূর্ব্বে অবস্থিত একটী মুসলমান প্রধান গ্রাম। পূর্ব্বে এই গ্রাম ও ফরিদপুর সহরের মধ্যে প্রায় ৩ মাইল লম্বা ও ১০।১১ মাইল পরিধি বেষ্টিত একটী প্রকাণ্ড বিল ব্যবধান

ছিল, কিন্তু অধুনা এই প্রকাণ্ড বিলটীতে সম্পূর্ণরূপে চড়া পড়ায় এই স্থানটী বহু সংখ্যক লোকের বাসস্থান হইয়াছে। এইরূপ প্রবাদ আছে যে, পূর্ব্বে এই স্থানে ঢোলনগর নামে একটী গ্রাম ছিল। কালক্রমে ঐ গ্রাম পদ্মার স্রোতে ধ্বংস হইয়া ক্রমে জল গর্ভে বিলীন হয়। পরে পদ্মানদী ক্রমে সরিয়া যায়, কিন্তু ঐ স্থানটীতে জল থাকিয়া বিলরূপে পরিণত এবং ঢোলসমুদ্র নামে অভিহিত হয়। ইহাও খুব সম্ভবপর, ঐ ঢোলনগরের কিয়দংশ বর্ত্তমান গেরদা গ্রামের সহিত মিলিত হইয়া গিয়াছে। কারণ এই গ্রামে মকবেস? অর্থাৎ কব্বর স্থান এখনও আছে।

এই কব্বর স্থানের একাংশ মাত্র (যাহা দরগা নামে অভিহিত হয়) এই দরগা গ্রামের উত্তর পশ্চিম প্রান্তে এখনও অবস্থিত আছে এবং গেরদা গ্রামের অন্তর্ভুক্ত বলিয়াই পরিচিত। নামটী দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে,গেরদা নামটী মুসলমানী নাম। কারণ গেরদা অর্থ গদী বুঝায়। গেরদা শব্দের অর্থ যে গদী ইহা "জয়নজবোলে" অর্থাৎ হাজরাত সা আলী বগদাদী সাহেবের আগমন স্থান নামক পার্সিয়ান পুস্তকে স্পষ্টই উল্লেখ আছে। এই গ্রামের পুরাতন নাম কি ছিল তাহা কেহই বলিতে পারেন না, কিন্তু ইহা সা সাহেব অথবা তাঁহার সমসাময়িক লোকদিগের আগমনের বহু পূর্ব্ব হইতেই যে বেশ সমৃদ্ধিশালী গ্রাম ছিল,তাহা কেহই সন্দেহ করিতে পারেন না। ইহার দৃষ্টান্তস্বরূপ এই গ্রামের অন্তর্গত দীঘি মুলুক খরসাদের উত্তর পাহাড়ে পীলখান অর্থাৎ হস্ত্যাগার খরলা নামে একটী স্থান আছে। ইহারই ঠিক উত্তরে একখণ্ড জমীতে কয়েকটী বড় পুকুর আছে, ইহার প্রত্যেক পুকুরই সম্পূর্ণ ভাবে অথবা প্রায়শঃ খুব বড় বড় পরিখা দ্বারা বেষ্টিত। এই পরিখা গুলিকে স্থানীয় লোকে গড় বলে। ইহাতে স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে যে,পূর্ব্বে ঐ স্থানে একটী দুর্গ ছিল। ইহারই ঠিক পশ্চিমে নগর নামে এক স্থান আছে। ঐ স্থান সম্ভবতঃ নিকটবর্ত্তী স্থানের বাজার ছিল। বর্ত্তমান সময়ে অল্প দিন পূর্ব্বেও জমি চাষ করিবার সময় বিভিন্ন স্থানে পুরাতন দেওয়াল এবং কটকের ভগ্নাবশেষ মাটীর তলে পাওয়া গিয়াছে। ইহার নিকটবর্ত্তী স্থানে কয়েকটী বড় বড় দীঘি ছিল, ইহার মধ্যে দীঘি মুলুক খরসেদ এখনও বর্ত্তমান আছে। অন্তগুলি বহু দিন পূর্ব্বেই চর পড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু সাগরদীঘি "দিঘি মাধবরাম" নিম দীঘি প্রভৃতি নামে ইহাদের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। ঢোলসমুদ্রের দক্ষিণ পূর্ব্ব পাহাড়িতে কয়েকটী কব্বর স্থান যুক্ত একটী পুরাতন মসজিদের ভগ্নাবশেষ এখনও দেখিতে

পাওয়া যায়। এই মসজিদ সা আলী বগদাদের সময়ের বলিয়া প্রবাদ আছে। ইহার কয়েকটী প্রস্তর স্তম্ভ আছে এবং ইহার একখানি প্রস্তর লিপিতে আরবীয় ভাষায় বাহাদুর খাঁর নাম লিখিত আছে। যে খানখানা বইরাম খাঁ ফতেয়াবাদের রাজুব দৌলত রায়কে পরাস্ত করিয়াছিলেন, এই বাহাদুর খাঁ সম্ভবতঃ তাঁহারই বংশধর। সাহ আলি বগদাদের অন্যতম বংশধর সায়েদ মহম্মদ মড্ ওরফে মদন মিঞা এখনও গেরদায় জীবিত আছেন। সাহ আলী বোগদাদের পুত্র সাহ ওসমান সাহেবের কবর অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। গেরদার সায়েদ আফজার হোসেন সাহ হোসেন টেগবরের বংশধর। ঢোলসমুদ্রের দক্ষিণ পারে সাহ হোসেন টেগবর হরনীর কবর অদ্যাপি বিদ্যমান আছে।

বঙ্গানুবাদ।

১। যাঁহারা দয়ালু এবং অনুকম্পাবান পরমেশ্বরের নামে বিশ্বাস স্থাপন করে, তাঁহারা যখন মিলন দিবসে প্রার্থনার ডাক পড়িবে; তখন পরমেশ্বরের নাম কীর্ত্তন করিবার নিমিত্ত ধাবিত হইবে এবং সমস্ত ক্রয় বিক্রয় বন্ধ করিবে।

২। ভবিষ্যদ্বক্তা বলিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি একটি মসজিদ নির্ম্মাণ করেন, জগদীশ্বর স্বর্গে তাঁহার জন্য একখানা গৃহ নির্ম্মাণ করেন। এই ভবিষ্যৎ বক্তার প্রতি তাঁহার আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করুন তাহাকে শান্তি দান করুন।

৩। ক্ষমাশীলের (ঈশ্বরের) ক্রীতদাস দ্বারবান আজিল বাহাদুর খান সুলতান ১০১৩ হিজরী।

এতদ্বারা জানা যায়, ৩১৪।১৫ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৫৯২ খ্রীষ্টাব্দে এই মসজিদ প্রস্তুত হইয়াছিল।

রাজা শ্যামল বর্ম্মার তাম্রশাসন।

কুলপঞ্জিকানুসারে রাজা শ্যামল বর্ম্মা ৯৯৪ শকে (১০৭২ খ্রীঃঅব্দে) সেন রাজাদের করদরূপে বিক্রমপুর শাসন করিতেন। সেনরাজগণ যেমন যজ্ঞ জন্য কনোজ হইতে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়াছিলেন, শ্যামল বর্ম্মা ও ঠিক ঐ কারণ পঞ্চ গোত্রীয় পাঁচজন বৈদিককে বিক্রমপুর আনয়ন করেন। তন্মধ্যে শৌনক গোত্রীয় যশোধর শর্ম্মাকে সামন্ত সার প্রদান করেন। এই তাম্রশাসন খানা কত দূর বিশ্বাস্য, তাহা ঠিক করিতে পারি নাই, তবে দুই শতবৎসরের হস্ত লিখিত পুস্তক হইতে উহা উদ্ধৃত করা হইল।

"ইহ খলু বিক্রমপুরনিবাসি-কটকপত্তেঃ শ্রীশ্রীমতঃ জয়স্কন্ধাবারাৎ স্বস্তি

সমস্ত-সুপ্রশস্ত্যুপেতসততবিরাজমানাশ্বপতিগজপতিনরপতি রাজত্রয়াধিপতি বর্ম্ম-বংশকুলকমলপ্রকাশভাস্করসোমবংশপ্রদীপ-প্রতিপন্নকর্ণগাঙ্গেয়শরণাগত-বজ্রপঞ্জর-পরমেশ্বর-পরমভট্টারক পরমসৌর-মহারাজাধিরাজ অরিরাজ বৃষভশঙ্কর গৌড়েশ্বর শ্যামলবর্ম্ম দেবপাদবিজয়িনঃ সমুপগতাশেষ রাজন্যকরাজ্ঞীরাণকরাজপুত্র রাজামাত্যমহাধার্ম্মিকমহাসান্ধিবিগ্রহিক পৌরপতিকদণ্ডনায়কবিষয়িপ্রভৃতীন-ন্যাংশ্চ রাজপাদোপজীবিনোঽধ্যক্ষ প্রবরান্ চট্টভট্টজাতীয়ান্ জনপদক্ষেত্রকরান্ ব্রাহ্মণান্ ব্রাহ্মণোত্তমান্ যথার্হং সমাজ্ঞাপয়তি বিদিতমস্তু ভবতাং বঙ্গবিষয়পাঠে বিক্রমপুরভূক্ত্যন্তে পূর্ব্বে নাগরকুণ্ডা দক্ষিণে ধীপুর পশ্চিমে লঙ্গাচুয়া উত্তরে কুলকুণ্ঠী চতুঃসীমাবচ্ছিন্নপঠকত্রয়া ভূমিঃ সজলস্থলাসখিলনানাসাকল্যপূগা সগুবাক নারিকেলাদি নানাবিধফলা মহাভূপেন ঘটিতা আচন্দ্রার্কক্ষিতিং যাবৎ স্বচ্ছন্দভোগেনোপভোক্তুং ঋগ্বেদীয় ঋগ্বেদান্তর্গতাশ্বলায়নশাখৈকদেশধারিণে শুনকগোত্রায় শ্রীযশোধরদেবশর্ম্মণে ব্রাহ্মণায় প্রাসাদোপরিশকুনপ্রপাতিতা যজ্ঞবিধৌ ভূমিচ্ছিদ্রন্যায়েন তাম্রশাসনীকৃত্য প্রদত্তাস্মাভিঃ। যদেতদ্ভি দেয়া ভূমিস্ত্রিংশোত্তরমতা তাদৃশহরণে নরকপতনভয়ং পালনীয়ধর্ম্মগৌরবাৎ। ধর্ম্মার্থসংস্থিতাঃ।

ভূমিং যঃ প্রতিগৃহ্লাতি যশ্চ ভূমিং প্রযচ্ছতি।
তাবুভৌ পুণ্যকর্ম্মাণৌ নিয়তৌ স্বর্গগামিনৌ॥
বহুভির্বসুধা দত্তা রাজভিঃ সগরাদিভিঃ।
যস্য যস্য যদা ভূমি স্তস্য তস্য তদা ফলম্॥
স্বদত্তাং পরদত্তাং বা যো লবেচ্চ বসুন্ধরাম্।
স বিষ্ঠায়াং কৃমি ভূত্বা পচ্যতে পিতৃ ভিঃ সহ॥
মন্নাদত্তামিমাং ভূমিং যঃ করোতি হি পালনং।
তস্য দাসস্য দাসোঽহং ভবেয়ং জন্মজন্মনি॥
ভক্ত হেয়া ন কর্ত্তব্যা শ্রোত্রিয়াণাং কথঞ্চন।
যদীচ্ছসি মহারাজ শাশ্বতীং গতিমাত্মনঃ॥
ভূমিদানস্য তু ফলং বৈকুণ্ঠপতিরব্রবীৎ।